উৎস মানুষ

৩৮ বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০১৮

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
সোশ্যাল মিডিয়া	পলাশেন্দু ভট্টাচার্য	৫
বেকারত্ব, ব্যাঙ্কলুট	শৈবাল কর	৯
দামোদরের বুকে চোরাবালি	তপোব্রত সান্যাল	১৩
চিনির বিকল্প	গৌতম মিস্ত্রী	১৫
আসমা জাহাঙ্গীর	বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৯
চিকিৎসক নিগ্রহ	জয়ন্ত দাস	২১
ফলম ফলে পাকামি	সমীরকুমার ঘোষ	২৫
ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ স্মরণ	অরুণকুমার ঘোষ	২৭
	বরুণ ভট্টাচার্য	২৮
শঙ্কর চক্রবর্তী / গৌরী লঙ্কেশ		৩০
চিঠিপত্র		৩১
সংগঠন সংবাদ		৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৬৫

ওয়েবসাইট : http://www.utsomanus.com

ই-মেল : utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক : https://www.facebook.com/utsomanus/

উন্নয়নের জোয়ারে

আমরা যারা তথাকথিত স্বর্গে বিশ্বাস করি না, তারা জানি স্বর্গ বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তা হল মার্কিন মুলুক। সেখানে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রাস্তায় গড়াগড়ি দেয়। তাই সে দেশের আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি প্রভৃতি যাবতীয় কিছু অনুসরণ করাই এখন আমাদের মোক্ষ। সেখানে নাকি প্রত্যেকেরই গাড়ি আছে। আর সেটা নাকি সুখ-সমৃদ্ধির মস্ত মাপকাঠি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের পুনেও স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এক সংবাদপত্রে 'মানুষের চেয়ে গাড়ি বেশি' শীর্ষক খবর থেকে জানতে পারি, পুনেতে মানুষের সংখ্যা ৩৫ লাখ, গাড়ি ৩৬.২ লাখ ছাড়িয়েছে। কলকাতা তথা এই পোড়া বঙ্গদেশ আগেই এই রেকর্ডের অধিকারী হত, যদি একলাখি গাড়ির কারখানাটা হত। অনেকে মনে করেন, তিনফসলী জমি বরবাদ করে কৃষিভিত্তিক রাজ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্প নয়, এমনকি লরি বা বাসও নয়, ছোট গাড়িই নাকি উন্নতির সোপান। জ্বলন্ত উদাহরণ হিন্দ মোটর। সংবাদপত্রের খবর, গুজরাটের সানন্দায় তৈরি গাড়ির বিক্রি দিন দিন কমছে। তৈরি গাড়ি লাট হয়ে পড়ে থাকছে।

রাঁচী বললেই আমরা পাগলাগারদ বুঝি। তার কারণটাও এবার স্পষ্ট হল! একই সংবাদপত্রে খবর, 'রাঁচী শহরকে দূষণমুক্ত করতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে সাইকেলকে রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা বেশ কিছু দিন ধরেই করছিল রাঁচী পুরসভা। চলতি মাসেই সেই ভাবনা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি হচ্ছে 'সাইকেল স্টেশন'। সেখান থেকে কয়েক ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য সাইকেল ভাড়া নিতে পারবেন সাধারণ মানুষ।' পরিসংখ্যান জানাচ্ছে বায়ুদূষণে কলকাতা দিল্লির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। তাকে টপকানোই আমাদের লক্ষ্য। বড় রাস্তায় সাইকেল চালালে পুলিস ঘেঁটি ধরে নিয়ে যায়। যার বাড়ি শ্যামবাজারে তিনি সাইকেল নিয়ে ধর্মতলা বা ডালহৌসিতে অফিস যেতে চান? তাঁকে ধরে রাঁচিতে পাঠিয়ে দিন। এ রাজ্যে সাইকেলের মতো দূষণহীন যান বরদাস্ত করা হবে না।

গাছেদের কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। যেখানে-সেখানে গজিয়ে উঠতে পারলেই হল। এতে যে মানুষের কত অসুবিধ হয়, উন্নয়ন আটকে যায়, সে খেয়াল তাদের থাকে না। এদিকে গাছ কাটতে গেলেই পরিবেশবাদী (আসলে উন্নয়ন-বিরোধী) নামে কিছু উটকো লোক হাঙ্গামা পাকাবে। যেমন যশোর রোডের কথাই ধরুন। আমাদের আরও চওড়া রাস্তা চাই। ইউরোপের অটো বান-এর আদলে ছয় লেনের না হোক অন্তত চার লেনের রাস্তা না হলে

পাঁচজনের কাছে মুখ দেখানো যায় না। বিনিয়োগকারীরাই বা কী বলবেন! বারাসত থেকে বহরমপুর, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক লম্বা-চওড়া করতে মাত্র ১৯ হাজার ১৭৫টা গাছ কাটা ঠিক হয়েছিল। উন্নয়নের কাজ ফেলে রাখতে নেই। ২০১৫-র মধ্যেই ১৭ হাজার গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। বারাসাত-টাকী রোডে কাটা হয়েছে দেড় হাজারেরও বেশি। গাছগুলো চারা নয় মহীরুহ। যশোর রোডে পাঁচটা ওভারব্রিজের জন্য ৩৫৬টা গাছ কাটার কথা মুখে বলা হলেও পূর্ত সচিব হলফনামায় বারাসাত থেকে বনগাঁ, ৫৯ কিলোমিটার পথের দু ধারের ৪,০৩৬টা গাছ কাটার অনুমতি নিয়েছে। এগুলো না কাটলে সাড়ে পাঁচ মিটার চওড়া রাস্তা চার লেনের করা যাবে না।

পরিবেশবাদীদের এক গোঁ। তারা ২০০৬-এর বৃক্ষরক্ষা আইনের ধুয়ো তুলছে। হাইকোর্টে মামলাও ঠোকা হয়েছে। মামলাকারীদের বক্তব্য, বনগাঁ-জয়ন্তীপুরে মাঝে গাছ রেখে দু পাশ দিয়ে রাস্তা যাওয়ার বিকল্প মডেল রয়েছে। এ রাস্তার সমান্তরালে বাংলাদেশ পর্যন্ত রেললাইন গিয়েছে, তার ব্যবহার বাড়ানো যায় অনায়াসেই। উল্টে সড়ক পরিবহনে খরচ ও দূষণ দুই কমে ইত্যাদি ইত্যাদি। ওদের কে বোঝায়, পরিকল্পনা হয়ে গেলে ওভাবে পাল্টানো যায় না। এতে মানীদের মানহানি হয়। গাছ কাটা এবং বিক্রিতে কত বেকার ছেলের অর্থ-সংস্থান হয়। পরিবেশও পরিচ্ছন্ন হয়। গাছের পাতা পড়ে, তাতে বাসা বাঁধা পাখির বিষ্ঠায় রাস্তার শ্রী থাকে না। গাছের দরকার হলে আমরা রুফ টপ গার্ডেন করে নিতে পারি। বারান্দায় টবে গাছ লাগাতে পারি। অক্সিজেনের প্রয়োজন হলে বসাতে পারি অক্সিজেন প্ল্যান্ট। তাই বলে সামান্য গাছের জন্য উন্নয়নে বাধা দেওয়াটা কখনই উচিত নয়। এক বিকল্প মসৃণ পথ অবশ্য আছে। গাছের গোড়ায় অ্যাসিড বা কোনো রাসায়নিক দিয়ে তার মৃত্যু ঘটানো। তারপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়াই যায়। বিভিন্ন জায়গায় হাতেকলমে এই কাজটি করে সুফল মিলছে। বাইপাসের ধারেও।

আমাদের সময় এখন খুব দামি হয়ে উঠেছে। তাই সম্প্রতি ঠিক হয়েছে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ওপর থাম গেড়ে গেড়ে একটি উড়াল পুল তৈরি হবে। তাতে অনেকটা পথ সাশ্রয় হবে। সাঁই সাঁই করে গাড়ি ওপর দিয়ে ছুটে রাজারহাট-নিউটাউন বা এয়ারপোর্টের দিকে চলে যেতে পারবে। সামান্য জলাভূমির চেয়ে আমাদের সময়ের দাম বেশি, উন্নয়ন জরুরি।

এই উন্নয়নকামীদের জন্য কয়েকটি স্বস্তির খবরও আছে। সম্প্রতি অকালেরই প্রয়াত হয়েছেন ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, দীপঙ্কর চক্রবর্তী। পূর্ব কলকাতা কিছু এঁদো জলাজমি বোজানো নিয়ে ধ্রুবজ্যোতিবাবু বিস্তর জলঘোলা করতেন। বেয়াড়া ধরনের লোক ছিলেন। বড় পদের প্রলোভন দেখিয়েও বাগে আনা যেত না। এবার অন্তত নিশ্চিন্তে জলাজমি বুজিয়ে বহুতল তৈরি করতে পারব। উন্নয়ন অবাধ হবে। হঠাৎ করে পূর্ব কলকাতায় চলে গেলে গগনচুম্বী অট্টালিকা দেখে যেন মনে হয়, কলকাতা নয় নিউ ইয়র্ক বা ম্যানহাটনে রয়েছি। মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। আরেক বেয়াড়া মানুষ দীপঙ্কর চক্রবর্তী। কাজ করতেন জলে আর্সেনিক নিয়ে। নির্বিচারে মাটির তলার জল তুলে নেওয়ায় কীভাবে আর্সেনিক হুহু করে ছড়িয়ে পড়ছে, তা নিয়ে সবাইকে সতর্ক করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন দীর্ঘদিন। নিজে উদ্‌যোগ নিয়ে নানা জায়গা থেকে জল আনিয়ে পরীক্ষা করতেন। এলাকা চিহ্নিত করতেন, মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করতেন। বেচারা সাধারণ মানুষ। তাদের পালাবার পথ কোথায়! এটা সবার জানা, গ্রামের বোরো চায়ের জন্য হোক বা শহরে বহুতলবাসীদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে– মাটির ওপরের জল যথেষ্ট নয়। নিচ থেকে জল তুলতেই হবে। তাতে একটু-আধটু আর্সেনিক ছড়াবে ছড়াক। আমরা আর্সেনিক ফিল্টার, প্ল্যান্ট ইত্যাদি বসাব। বিদেশ থেকে প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি আনব। তা না করে সহজ উপায় হিসাবে ধমকে, চমকে বলে উঠতে পারি, কে বলেছে এই জলে আর্সেনিক আছে? হাত-পায়ের ক্ষত? ওসব ভিটামিনের অভাব। দীপঙ্করবাবু চলে যাওয়ায় আপাতত শান্তি। লোকটা বড্ড ঘ্যানর ঘ্যানর করত।

প্রয়াত হলেন শঙ্কর চক্রবর্তী এবং রতনলাল ব্রহ্মচারীও। গ্রামেগঞ্জে গিয়ে বিজ্ঞানকে সহজভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে, জনপ্রিয় করতে বহুদিন লেগে ছিলেন ওঁরা।

ধ্রুবজ্যোতিবাবু বা দীপঙ্করবাবুরা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুতে পার পেয়ে গিয়েছেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও জনপ্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবালকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া গেছে। মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই চালাচ্ছিলেন। জঙ্গিরা অনেকবার প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। তিনি থোড়াই কেয়ার করে নিজের কাজ করে চলেছিলেন। শেষে গত মাসে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন দুই আততায়ী ছুরি নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোপাতে থাকে। তবে এ যাত্রায় তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন।

ধর্ষণ মহামারী আকার ধারণ করছে। নাগরিক সমাজ সোচ্চার। পাশাপাশি যেটা নিয়ে সবাই নীরব তা হল, স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে গবেষক, চিকিৎসক, উঠতি অভিনেত্রী– আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গেছে। আমাদের সমাজবিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানীরা কাগজে নানা গম্ভীর মতামত দিয়ে চলেছেন। এটা বড় রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এ দিয়ে ভোট হয় না। তবু মনে হয়, এই সমস্যাটা নিয়ে সমাজগুরুদের ভাবা উচিত। রোগটা যে আখেরে সামাজিক।

উমা

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

আশীষ লাহিড়ী

(৪)

উত্তরে থাকো মৌন

এক

পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের কাছে সমর বাগচী একটি নিত্যস্মরণীয় নাম। বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের জাগ্রত বিবেক তিনি। পঁচাশি বছর পেরিয়ে এসেও সেই জাগ্রত বিবেকের ভূমিকা পালনে ক্ষান্তি নেই তাঁর।

সমরবাবুর কাছ থেকে ৪ মার্চ ২০১৮ প্রথমে একটি ফোন এবং পরে একটি ই-মেল পাই আমি। গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অভ কালচার-এর সচিব স্বামী সুপর্ণানন্দকে পাঠানো ই-মেলটি তিনি আমাকে ফরোয়ার্ড করেন। বঙ্গানুবাদে ই-মেলটি এইরকম :

আশীষবাবু, এ বিষয়ে আগে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ,
সচিব, আর কে এম আই সি, গোলপার্ক,

আমি পূর্ব ভারতের পাঁচটি বিজ্ঞান সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ ছিলাম, যেগুলির সদর দপ্তর ছিল কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেক্‌নলজিক্যাল মিউজিয়াম। আপনার প্রতিষ্ঠানের বহু অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়ে আসছি। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ যখন সচিব ছিলেন, সেই সময় আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তিনি আমার সেই বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন।

আপনাকে এ চিঠি লেখার উপলক্ষ হল গত কালকের (৩ মার্চ) আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর। খবরটি আমার মনকে খুশিতে ভরিয়ে তুলেছে। বেশ কিছুকাল ধরে আমি স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ্য করছিলাম যে আর এস এস এবং বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ছবি নিয়ে মিছিল বার করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দর ভাবধারা আর এস এস-এর মতাদর্শর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। নানা রঙের তথাকথিত হিন্দু মৌলবাদীরা যে-অসহিষ্ণুতাকে চিরস্থায়ী করে তুলছে, দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশন তার প্রতিবাদ করেছে।

আনন্দবাজারে প্রকাশিত সেই খবরটি হয়তো আপনার নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকবে, তাই খবরটি আমি উদ্‌ধৃত করে দিলাম :

গো-রক্ষার তাণ্ডব

গো-রক্ষক বাহিনীর বাহুবল কিংবা জোর করে ধর্মান্তরকরণ হিন্দু ধর্মের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নয়। বরং হিন্দু ধর্মের বিচ্যুতি। গো-রক্ষার নামে তাণ্ডবের মধ্যে এই মত রামকৃষ্ণ মিশনের দিল্লি শাখার সচিব স্বামী শান্তাত্মানন্দের। স্বামীজী বলেন, ‘‘রাজনীতির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা সেই হিন্দু ধর্মে আস্থা রাখি যে সুপ্রাচীন ধর্ম সহিষ্ণুতা, বহুত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।’’ উনি আরও মন্তব্য করেন, ‘‘সন্ত্রাসবাদ আর ইসলামকে এক করে দেখা ঠিক নয়। কারণ ইসলাম কখনোই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না।’’

খবরের কাগজে পড়লাম, আর এস এস-এর অধ্যক্ষ মোহন ভাগবত বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশনে এসেছিলেন। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র থেকে আমি শুনেছি যে মালদায় একটি সভায় রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ এবং আর এস এস-এর অধ্যক্ষ মোহন ভাগবত একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি, হিন্দু মতাদর্শ প্রচার করার জন্য আর এস এস-এর অধ্যক্ষ মোহন ভাগবতের প্রশংসা করেন।

শুনে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। এ তো গুরুনিন্দার সামিল। এ খবর মিথ্যা হলে আমি খুশি হব।

আমার খুব আনন্দ হবে, যদি আপনার প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে (দিল্লি শাখার অনুরূপ) একটি বিবৃতি প্রচার করে।

আন্তরিক শ্রদ্ধা সহ,
সমর বাগচী

ছিয়াশি বছর বয়স্ক এক তরুণ, যে জীবনের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় : ''বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়/অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।''

২৩ মার্চ ২০১৮ প্রেসে যাওয়ার সময় অব্দি এই ই-মেলের কোনো উত্তর পাননি বলে জানিয়েছেন সমরবাবু।

আমাদের কাণ্ডজ্ঞানে একটা জায়গায় খটকা লাগছে। শুনেছি, রামকৃষ্ণ মিশন কমিউনিস্ট পার্টির চেয়েও রেজিমেন্টেড ও সুসংগঠিত। সেক্ষেত্রে, বেলুড়ের সদর দপ্তরের অনুমোদন ছাড়াই দিল্লি ইউনিটের প্রধান কী করে অমন একটা বিবৃতি দিলেন? এটা কি কমিউনিস্ট পার্টির 'দুই লাইনের দ্বন্দ্ব'-গোছের কিছু একটা? নাকি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়কার চীনের সেই 'সদর দপ্তরে কামান দাগো' গোছের ব্যাপার?

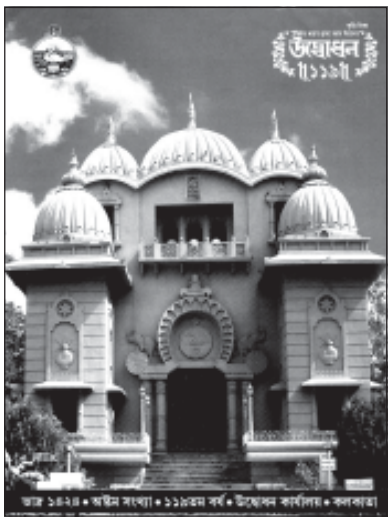

দুই

সে যাই হোক, আর এস এস-এর সঙ্গে, নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে, রামকৃষ্ণ মিশনের ঘনিষ্ঠতা কিছুকাল ধরেই বেশ চোখে পড়ার মতো। নরেন্দ্র মোদী এক সময় রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিতে এসেছিলেন, এ তথ্য এখন সবারই জানা। এও জানা যে, রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন মঠ ছেড়ে রাজনীতিতে যেতে। দেশের এত বড়ো সর্বনাশ করার জন্য লজ্জা পাওয়ার বদলে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক ভক্তকে বরং উল্লসিতই হতে দেখেছি। তার লিখিত প্রমাণও আছে, এবং বড়ো মারাত্মক তাৎপর্য।

উদ্বোধন পত্রিকার ভাদ্র ১৪২৪ (আগস্ট ২০১৭) সংখ্যার ৫৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তর' বিভাগের একটি অংশ উদ্ধার করা যাক। একজন 'ছাত্র'র প্রশ্ন: শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ভগবানের - বিষ্ণুর- অবতার হয়েই পৃথিবীতে এসে থাকেন, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণর জীবৎকালে অর্থাৎ ১৮৩৬ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত বিষ্ণু কোথায় ছিলেন, বৈকুণ্ঠে, নাকি কামারপুকুর-দক্ষিণেশ্বরে? বিষ্ণুও আছেন, আবার তাঁর অবতারও আছেন, এ বড়ো কঠিন ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন! এমন মেধাবী ছাত্র বাঁচলে হয়।

উত্তরে বলা হয়েছে, বিষ্ণু আছেন 'সব জায়গাতেই।' বোঝাবার জন্য ভিডিও কনফারেন্সের এবং ল্যাপটপের দ্বিমাত্রিক, এমনকি ত্রিমাত্রিক চিত্রর ('যেন সশরীরে আবির্ভূত') উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু '*যেন* সশরীরে আবির্ভূত' আর '*সত্যিই* সশরীরে আবির্ভূত'-র মধ্যে যে-মৌলিক তফাত, সেটাকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হল। মেধাবী ছাত্রটি যদি এবার প্রশ্ন তোলে : তাহলে আপনাদের মতে ঈশ্বর কি ওই দ্বিমাত্রিক-ত্রিমাত্রিক ছবির মতোই 'ভার্চুয়াল', রিয়্যাল নন? তার কী উত্তর দেবেন উত্তরদাতা? সে-জায়গায় না গিয়ে উত্তরদাতা জানান, প্রযুক্তির আরো উন্নতি হলে একজন চেন্নাইয়ে বসেই দশ মিনিটের জন্য কলকাতায় এসে চা খেয়েই শ্রীনগরে গিয়ে লাঞ্চ করে আসতে পারবে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণর অবতার-দশাকালে বিষ্ণুর পক্ষে একই সঙ্গে বৈকুণ্ঠ, কামারপুকুর আর দক্ষিণেশ্বরে থাকা সম্ভব হবে না কেন? বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-ধর্মতত্ত্বর সমন্বয়ে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল কত সহজে। রবীন্দ্রনাথের কথা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে পারি, 'বিজ্ঞানের হদ্দমুদ্দ!'

মেধাবী ছাত্রটি আবার যদি প্রশ্ন তোলে, তাহলে দশ অবতারের প্রত্যেকের পক্ষেই — যার মধ্যে বরাহ কিংবা কুর্ম অবতারও আছেন — কি একই সঙ্গে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে বিরাজ করা সম্ভব? জানি না কোন আগামী প্রযুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

কিন্তু উদ্বোধনের বিজ্ঞান-অন্বেষা এখানেই থামে না। ছাত্রছাত্রীদের মগজে মোক্ষম বৈজ্ঞানিক যুক্তিটা সুকুমার রায়ের ঢঙে গজাল মেরে গোঁজানোর মানসে এবার আসরে

অবতীর্ণ হন নরেন্দ্র মোদী, যিনি গণেশের ঘাড়ে হাতির মুণ্ডু প্রতিস্থাপন-প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ। উদ্বোধনের প্রজ্ঞানী উত্তরদাতা ছাত্রদের সগৌরবে জানান :

গত নির্বাচনে শ্রী নরেন্দ্র মোদী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একশোটা কেন্দ্রে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সব জায়গাতেই মনে হয়েছিল— তিনি সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। কিভাবে? ফোর-ডি হোলোগ্রাম প্রযুক্তির সাহায্যে।

আবার সেই 'মনে হয়েছিল' প্রসঙ্গ। অথচ প্রশ্নটা ছিল, *সত্যি সত্যিই কি* বিষ্ণুর পক্ষে একই সঙ্গে কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর আর বৈকুণ্ঠে বিরাজ করা সম্ভব? আবারও এই কূট প্রশ্নে না-ঢুকে উদ্বোধনের 'স্যার' জানান, নরেন্দ্র যদি একশো জায়গায় হাজির থাকতে পারেন, তাহলে ঈশ্বর এবং তাঁর অবতাররা একই সময়ে বৈকুণ্ঠ, কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, মালদা কিংবা ওয়াশিংটনে হাজির থাকতে পারবেন না কেন? রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জ্যোতিষে বিশ্বাসীদের বিদ্রুপ করে যা বলেছিলেন, এ-'যুক্তি' যেন তারই রকমফের: চন্দ্রের টানে যদি জোয়ার-ভাঁটা হয়, তবে রামবাবুর জজিয়তি হইবে না কেন? ইলিউশন আর রিয়্যালিটি, বিভ্রম আর বাস্তবকে গুলিয়ে, মিশিয়ে বুদ্ধির পিণ্ডি চটকে দেবার এ এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির মুখে মোহন ভাগবতের প্রশংসা শুনে 'লজ্জায়' সমরবাবুর 'মাথা হেঁট হয়ে গেছে। এ তো গুরুনিন্দার সামিল।' সমরবাবু তাঁর চিঠিতে ইংরেজিতে blasphemy কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। ঈশ্বরে ভক্তি নেই বলে আমি এর যুৎসই বাংলা খুঁজে পাইনি, তাই লিখেছি 'গুরুনিন্দা।' ওর আসল অর্থ কিন্তু ঈশ্বরনিন্দা, যা পরম পবিত্র তাকে ধুলোয় টেনে এনে অপবিত্র করা। ঈশ্বর যে সর্বত্রব্যাপী, এটা বোঝানোর জন্য যেসব ঈশ্বরভক্তকে মোদীর নির্বাচনী বক্তৃতায় লেজার-প্রযুক্তির উদাহরণ টেনে বলতে হয়, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর', তাঁরা কি এই অর্থে ঈশ্বরনিন্দার দোষে দোষী নন? তাঁদের মাথা হেঁট হবে কবে?

কাণ্ডজ্ঞান কী বলে?

উমা

সোশ্যাল মিডিয়া নয়া উৎপাত, নাকি এক নতুন সম্ভাবনা?

পলাশেন্দু ভট্টাচার্য

অতি সম্প্রতি ধর্মগুরুর সঙ্গিনী ধরা পড়া অথবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে মৌলবাদীদের হাতে যুক্তিবাদী ব্লগার খুন; কিংবা অনেকদিন আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিবার সদস্যদের পুনর্মিলন। রাগে ফেটে পড়া কবি শ্রীজাতের ফেসবুক প্রতিবাদ এবং তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ক্ষোভ এসবই আমাদের অতি-পরিচিত। ফেসবুক, ইউ টিউব, হোয়াটস্অ্যাপ, ট্যুইটার এখন আমাদের নিত্যসঙ্গী। নৈতিকতা জাহির করতে বিধর্মী সহ-নাগরিককে খুন করার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ার দেয়ালে টাঙানো নতুন বছরে দেয়ালে নতুন ক্যালেন্ডার ঝোলানোর থেকেও সহজ। স্মার্টফোনের কল্যাণে তা আমজনতার তালুবন্দি। মন্ত্রী-সেলিব্রিটিদের ট্যুইটারি রোজকার সংবাদপত্রের হেডলাইন। সিনেমার প্রোমো থেকে ভোটের মহড়া— এই ইন্টারনেটের দৈত্য প্রায় সর্বত্রগামী। অতি-ধনী থেকে প্রায় সর্বহারার তালুবন্দি 'হাতফোন' তাই আলাদিনের প্রদীপের থেকেও কাঙ্ক্ষিত।

বদলগুলো বেশ চোখে পড়ার মতো— ক্রেতা-গ্রাহক মানসিকতায়। 'কালা-পিলা' ট্যাক্সি ছেড়ে 'ওলা-উবের' অর্থাৎ মোবাইল 'অ্যাপ-বেসড' ট্যাক্সি (মায় সেদিনের রেডিও ট্যাক্সিও প্রায় বাতিল)। ইচ্ছেমতো জিনিসের খরিদ্দারি ই-টেইল-এর (আমাজন, ফ্লিপকার্ট ইত্যাদি) ওয়েব পেজে। এদের পরিষেবার মানও সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর হয়ে উঠছে। মনে করে দেখুন, দেশের রাজধানীতে সম্প্রতি 'অ্যাপ-বেস্ড' সংক্রান্ত দুর্ঘটনা খবরের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছিল ওই সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে। আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন বা জেএনইউ-এর ছাত্র আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়ার উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটছে। আমরা ব্যবহার করছি, ব্যবহৃত হচ্ছি। কতক বুঝছি, কিছু বোঝার আগেই ঘটে যাচ্ছে। সংবাদের আদান-প্রদান, জনমত গঠন ঘটে যাচ্ছে আলোর গতিতে। স্বভাবতই কৌতূহল

হয় কেমন করে হচ্ছে এসব? খুব ভাল, নাকি ভাল-মন্দে মেশা? প্রথাগত মাধ্যমের (যেমন প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন ইত্যাদি) সঙ্গে কতটা মিল, কোথায় বা অমিল? বাজেট অধিবেশন চলাকালীনই বাজেট সংক্রান্ত মত, পাল্টা মত ঢুকে পড়ছে আমাদের হাতফোন-এ 'হোয়াটস্-অ্যাপ মেসেজ' হয়ে। আমরাও মহা উৎসাহে তা চারিয়ে দিচ্ছি আরো পাঁচটা হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপে বা কোনো নির্দিষ্ট বন্ধুকে। কিছু মেসেজ যেন নেহাতই তাৎক্ষণিক চিন্তার প্রতিফলন; কিছু বা একটু অন্যরকম, যা 'ফরোয়ার্ডেড মেসেজ'; এর পেশাদারি দক্ষতা চোখ এড়ায় না। ঘটনার প্রবহমানতা, গতি অনেক সময় আমাদের বোঝার সময় দেয় না। তাই একটু থামা যাক, চিরে দেখা যাক কী আছে পর্দার ওপারে।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই বিশ্বজোড়া জাল অবশ্যই সম্ভব হয়েছে 'আন্তর্জাল' বা 'ইন্টারনেট'-এর হাত ধরে। এ যেন সারা দুনিয়া জোড়া মায়াজালের ফাঁদ; বদলাচ্ছে প্রতিনিয়ত। শুরু হয়েছিল ৬০-এর দশকে মূলত আমেরিকা প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাত ধরে। তারপর ছোট বড় পরিবর্তনের হাত ধরে ৯০ দশকের মাঝ বরাবর ইন্টারনেটের জোরালো উপস্থিতি। বদলে যেতে থাকে শতাব্দী জুড়ে গড়ে ওঠা অভ্যেস। 'আজ বিকেলের ডাকে চিঠি' পাবার আশায় কেউ বসে রইল না! চিঠির জায়গা করে নিল ই-চিঠি (ই-মেইল), দূর দেশের সঙ্গীর সঙ্গে আলাপচারিতা জমে উঠল VOIP-র (Voice over Internet protocal) মাধ্যমে। এই প্রযুক্তিরই উত্তর পুরুষ হল আজকের Web2.0। মূলত এই প্রযুক্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার মহীরুহ। আমরা অতি সহজে তৈরি করে নিচ্ছি আমাদের প্রোফাইল ফেসবুক, লিঙ্কেডিন-এর পাতায়। কখনো বা ব্যক্তি বিশেষের, কখনো বা কোনো বাণিজ্যিক সংস্থার। প্রোফাইলের পাতায় লাগিয়ে ফেলতে পারি সময়োপযোগী ছবি; বসন্তকালে আমার স্টেটাস-এ লিখে ফেলতে পারি 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। অর্থাৎ আমি কী ভাবছি, কী জানাতে চাইছি ইত্যাদি। এই প্রযুক্তির হাত ধরে ফেলছি কাছের অথবা দূরের মানুষের; চেনা অথবা না-চেনা আলাপ জুড়ে যাচ্ছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট-এর মাধ্যমে। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এই মাধ্যমটির বিষয়বস্তু (কনটেন্ট) তৈরির পদ্ধতি এবং তা ভাগ করে নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে। বিষয়বস্তু তৈরি নয় বরং এই মাধ্যমগুলির লক্ষ্য গ্রাহকদের (ইউজার) বিষয়বস্তু তৈরির উপায়টা সহজ করা এবং তা প্রকাশে সাহায্য করা। সুতরাং প্রথাগত মাধ্যমের যা মূল সমস্যা 'কী বলব, কেমন করে বলব'-র বদলে গ্রাহক ঠিক করে ফেলতে পারে সে কী শোনাবে, অথবা অন্য কারো কথা আরো অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নেবে। এভাবেই বারাসতের কালীপুজো বস্টনে লাইভ দেখে ফেলছি নিজস্ব হাতফোনে কোনো টেলিভিশন সম্প্রসারণ ছাড়াই। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেটের সারমর্ম তুলে ধরতে পারেন আমজনতার কাছে ধারাবাহিক ট্যুইটারের মাধ্যমে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নস্যাৎ করতে পারেন ওবামা জমানার স্বাস্থ্যনীতি। আর আমজনতা বলতেই পারেন 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে'। অর্থাৎ 'পড়তে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়'-এর যুগ থেকে user created content-এর সময়। এসবের মধ্যেই প্রথাগত মিডিয়া হাউসগুলির উঠছে নাভিশ্বাস। প্রতি মুহূর্তে তাদের বদলাতে হচ্ছে, বুঝে নিতে হচ্ছে— সময়োপযোগী হয়ে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা। প্রায় সব মিডিয়া হাউসেরই ওয়েব উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। এবং এরাও সোশ্যাল মিডিয়াগুলিকে নানানভাবে ব্যবহার করে তাদের পাঠক-দর্শকদের আরো কাছাকাছি পৌঁছতে চাইছে। কোন খবর ভাইরাল হয়ে উঠছে, কোন লাইভ বিতর্ক অনুষ্ঠান দর্শক পছন্দ করছেন, তা জানা যাচ্ছে ওই প্রথাগত মিডিয়াগুলির ফেসবুক-ট্যুইটারের পাতায়। আপনি সঞ্চালকের পক্ষে না বিপক্ষে, এরকম অনেক কিছুই প্রতি রাতের টেলিভিশন চ্যানেলে 'nation wants to know' এবং এভাবেই দেশবাসীকে জানিয়ে এবং বুঝিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে, চলবে।

আমাদের দেশের সব থেকে জনপ্রিয় তিনটি সোশ্যাল মিডিয়া হল যথাক্রমে ইউটিউব, ফেসবুক এবং হোয়াটস্অ্যাপ। এগুলি ছাড়াও ট্যুইটার, ইনস্ট্রাগাম, লিঙ্কডেনও খুব পিছিয়ে নেই। এই মাধ্যমগুলোতে অনায়াসে তথ্য, তত্ত্ব, গান বাজনা, কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদি অনেক কিছুরই অনেক সহজ আদান-প্রদান হতে পারে। কোনো 'সিক্রেট সুপারস্টার' চোখরাঙানি উপেক্ষা করে সারা দুনিয়াকে গান শুনিয়ে অভিভূত করে দিতে পারে (ইউ টিউব), জনপ্রিয় গায়ক তাঁর বসার ঘর থেকে লাইভ ওয়েব কাস্ট করতে পারেন ফেসবুকের পাতায়। কোনো কর্মপ্রার্থী তাঁর জীবনপঞ্জি আপলোড করতে পারেন লিঙ্কডেন-এর পাতায়; আবার সংস্থাগুলি তাদের পছন্দমতো প্রার্থী খুঁজে নিতে পারে। অর্থাৎ এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলির কাজের ক্ষেত্র আলাদা—

স্বভাবতই বাজার আলাদা। ভুলে গেলে চলবে না এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলি এক-একটি প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক সংস্থা। এদের কাজের পিছনে তাই লাভ-ক্ষতির হিসেব নিশ্চয়ই আছে।

এদের মুনাফালাভের পদ্ধতি মূলত তিনটি। বিজ্ঞাপন, সাবস্ক্রিপশন বা সদস্যদের জন্য ধার্য চাঁদা এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল এদের সার্ভার-এ জমে ওঠা তথ্যভাণ্ডার (ডেটা)। অধিকাংশ সোশ্যাল মিডিয়া গ্রাহকদেরই কোনো চাঁদা দিতে হয় না। যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটস অ্যাপ ইত্যাদি। আবার কোথাও চাঁদা দিতে হয়। যেমন লিঙ্কডেনের প্রাথমিক সদস্য হতে গেলে কোনো খরচ নেই, তবে যদি আপনি প্রিমিয়াম সার্ভিস পেতে চান তবে চাঁদা ধার্য আছে।

বিজ্ঞাপন আরো বেশি কার্যকর রাস্তা। যেমন ইউটিউব-এ প্রিয় শিল্পীর গান শুনতে গেলে হামেশাই বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। যেটি যত বেশি জনপ্রিয় সেখানে বিজ্ঞাপন তত বেশি। অনেকটা টেলিভিশনের অ্যাড-ব্রেকের মতো। এই মাধ্যমগুলি অপেক্ষাকৃত কম দাম এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বিজ্ঞাপনদাতাদের আরো বেশি আকৃষ্ট করছে। আবার খেয়াল করে দেখুন হোয়াটস-অ্যাপ-এ কোনো বিজ্ঞাপন নেই; অর্থাৎ এদের ব্যবসার পদ্ধতি আলাদা।

এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলির ব্যবহার যত বাড়ছে, এদের তথ্যভাণ্ডার ততই ভরে উঠছে। এই তথ্য বাণিজ্য এবং বিজ্ঞাপন দুনিয়ার জন্য সোনার খনি। আপনার নাম, সাকিন, জন্মতারিখ, বিবাহবার্ষিকী থেকে আপনার চাওয়া-পাওয়া, রাগ-দুঃখ-ভালবাসার দিনলিপি ফেসবুকের পাতায়। ধরা যাক, আপনি মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে চলেছেন দেশে বা বিদেশের কোনো সুন্দর জায়গায়। স্বভাবতই এই খুশির খবরটি জানাতে চাইবেন ফেসবুকের পাতায়। অনেক লাইক, শুভেচ্ছা বর্ষিত হবে আপনাদের দীর্ঘ সুখী জীবন কামনা করে। তেমনি ব্যবসায়িক কারণেও এই তথ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এই তথ্য হাতের কাছে থাকলে একটি বিমা কোম্পানি আপনাকে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স বেচতে পারে; একটি ভ্রমণসংস্থা চমৎকার একটি প্যাকেজ বানাতে পারে শুধু আপনারই জন্য। আর পরের বছর আপনার বিবাহবার্ষিকীতে একটি জুয়েলারি কোম্পানি শুভেচ্ছা পাঠাতে পারে ডিসকাউন্ট কুপনের সঙ্গে। সম্ভাবনা অনেক।

ভুলে গেলে চলবে না এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলি এক-একটি প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক সংস্থা। এদের কাজের পিছনে তাই লাভ-ক্ষতির হিসেব নিশ্চয়ই আছে। এদের মুনাফালাভের পদ্ধতি মূলত তিনটি। বিজ্ঞাপন, সাবস্ক্রিপশন বা সদস্যদের জন্য ধার্য চাঁদা এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল এদের সার্ভার-এ জমে ওঠা তথ্যভাণ্ডার (ডেটা)।

কনজিউমারিজম্-এর চেনা ছক নয়, নতুন হাতছানি। কোনো প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হাউসের মনোলোগ নয়, কলরব। যেহেতু কলরব, তাই একমুখী নয়। গঙ্গা যেমন হিমবাহের জলে পুষ্ট, তেমনি শহর-জনপদের গ্লানি, কারখানার কালিমা তাকে রিক্ত করে— সোশ্যাল মিডিয়াও তেমনি। ভাল গান, সুস্থ আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের পাশাপাশি অসুস্থ যৌনতা, গা-জোয়ারি মত চাপিয়ে দেবার প্রবণতা প্রবল। কোনো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বা সমর সেনের প্রাজ্ঞতায় সিক্ত হবার সম্ভাবনা কম। পেশাদারি নানান সংস্থা প্রভাবশালী ধর্মীয়-রাজনৈতিক-সামাজিক সংস্থাগুলির অর্ডারি মাল সরবরাহ করে চলেছে অবিরত। খেয়াল করে দেখুন, সারাদিনে পাওয়া হোয়াটস-অ্যাপে পাওয়া মেসেজগুলির কতগুলি আপনার বন্ধুদের লেখা আর কতগুলি ফরোয়ার্ডেড অডিও-ভিসুয়াল টেক্সট। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও সেই কী লিখবেন, কেন লিখবেন-এর অদৃশ্য সুতো আপনার ভাবনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে চলেছে অবিরত। এই ফরোয়ার্ডেড মেসেজগুলির সত্যতা যাচাই হচ্ছে না কোনো সম্পাদকের কলামে। তাই বিরোধী কণ্ঠ চাপা পড়ে যাচ্ছে। শত ফুল বিকাশের বদলে নির্দিষ্ট ফুল প্রীতির প্রাদুর্ভাব। এই কারণেই সোশ্যাল মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতায় ঘাটতি। রয়টার ইনস্টিটিউট সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলছেঃ‘The internet and social media may have exacerbated low trust and ‘fake news’ but we find

that in many countries the underlining drivers of mistrust are as much to do with deep rooted political polarisation and perceived mainstream bias.' নিজেদের মতবাদে জারিত করে সংবাদ প্রকাশ কোনো নতুন ঘটনা নয়, তবে ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে তা মহামারী রূপ পেয়েছে। তাই প্রথাগত মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা এখনো প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। (সূত্রঞ্জ রয়টার ইনস্টিটিউট সমীক্ষা)। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা বাড়ছে অভাবনীয় হারে। এই মুহূর্তে ভারতে এই মিডিয়ার গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি। ২০২১ সালে ভারতে শুধু ফেসবুক গ্রাহকের সংখ্যা হবে ৩২ কোটি। কলরব কলেবরে বাড়ছে।

বন্ধুর জীবন বাঁচাতে অতি প্রয়োজনীয় রক্ত সংগ্রহের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে হোয়াটস অ্যাপ; আবার ফেক ফরওয়ার্ডেড মেসেজ ক্রমাগত ফরওয়ার্ড করে কোনো হাসপাতাল বা ব্লাডব্যাঙ্ককে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে এই হোয়াটসঅ্যাপ (অতি সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে ঘটে যাওয়া ঘটনা)।

এই প্রযুক্তির কল্যাণেই অন্য কণ্ঠস্বরও অনেক সহজে শোনা যাচ্ছে। কবির সুমন অথবা রামের (ইন্ডিয়ান ওসিয়ান) প্রতিবাদী কণ্ঠ ইউটিউবে ভাইরাল হয়ে উঠছে। শ্রীজাতর সরস্বতী পুজোকালীন হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুকের পাতায় লেখা কবিতা দুটির প্রাসঙ্গিকতা অনেক মানুষকে সুস্থ সংস্কৃতির স্বাদ জোগায়। গ্রুপ থিয়েটার আর অ্যাকাডেমি সমাচার আরো বেশি করে সোশ্যাল মিডিয়ার উপজীব্য হয়ে উঠুক। উৎস মানুষ-এর বইয়ের পাতা ফেসবুকের দেয়ালে উঠে আসুক।

আমি বা আমরা কীভাবে একে ব্যবহার করব, তা অন্যান্য মাধ্যমের মতো এক্ষেত্রেও নির্ধারিত হবে রুচি, শিক্ষা, ভাবনা এবং অবশ্যই শ্রেণীচরিত্র দ্বারা। কিন্তু সুখের কথা, আপনি চাইলে বড় বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধেও গান গাইতে এবং প্রকাশ করতে পারেন (যেমন ইন্ডিয়ান ওসিয়ান ব্যান্ড, কবির সুমন এবং আরো অনেকে) এবং কোটি মানুষের বেড়াজাল ডিঙিয়ে। তাই আমরা হোয়াটসঅ্যাপকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যবহার করব, নাকি গণেশকে দুধ খাওয়াতে নিয়োজিত করব আমাদেরই ভাবতে হবে। সারা দুনিয়া জোড়া যৌনজ্বরে জারিত হব, নাকি 'নির্ভয়া'-র ওপর হওয়া অত্যাচারে ক্ষোভে ফেটে পড়ব, নারীর স্বাধীন-নির্ভীক-স্বাভাবিক জীবনের পক্ষে সওয়াল করব– আমাদেরই ঠিক করে নিতে হবে। আমরা, যারা সুস্থতার ফুল ফোটাতে চাই, বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের স্বপ্ন দেখি, শুধুই নিষ্ক্রিয় (প্যাসিভ) গ্রাহক হিসাবে নয়, সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে নজর রাখতে হবে— 'কারা কখন কীভাবে কেন লিখছে, কারা মুছে দিচ্ছে এবং কারা তাবৎ মোছামুছি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আবার লিখছে...'

পঙ্‌ক্তিটি মণিভূষণ ভট্টাচার্যের কবিতা 'একটি স্লোগানের জন্ম' থেকে।

উমা

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

ফি বছর বর্ষা মানেই বন্যা। বন্যা নিয়ে এর আগে আমাদের দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বন্যা এখনও প্রাসঙ্গিক। তাই সমসময়কে ধরে উৎস মানুষ প্রকাশ করতে চলেছে নতুন সঙ্কলনগ্রন্থ।

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান : বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪

২। প্রকাশকাল : ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রক : বরুণ ভট্টাচার্য

৪। মুদ্রণস্থানঞ্জ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৬।

৫। সম্পাদক : সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ, ২০১৮ **বরুণ ভট্টাচার্য**
প্রকাশক

বেকারত্ব, ব্যাঙ্কলুট, সরকারি উদাসীনতা

শৈবাল কর

ভারতে এই মুহূর্তে সবথেকে চর্চিত বিষয়টি হল কেমন করে একটি বা দুটি বৃহৎ ব্যবসা আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যবসায়ী সরকারি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা সেখান থেকে ধার নিয়ে আর ফেরত দেয় না। তার থেকেও বড় সমস্যা, এই ব্যবসায়ীরা কেমন করে ভারতের আইন ফাঁকি দিয়ে একেবারে অন্য দেশে পাড়ি দেয়। এদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করা একপ্রকার অসম্ভব বলেই মনে করেন ওয়াকিবহাল মহল। সাধারণ হিসেব বলে আমাদের দেশের গরিব মানুষেরা সরকারি ব্যাঙ্কের নিট পুঁজি-সরবরাহকারী আর বড়লোক উপভোক্তা নিট ঋণ গ্রহণকারী। সুতরাং, সরকারি ব্যাঙ্ক যখন কোটি কোটি টাকা ধার দিয়ে তা ফেরত পায় না, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে গরিব মানুষের টাকা বোধহয় আর ফেরত পাওয়া যাবে না। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়ার আগে এরকম কোটি টাকা নিয়ে শোধ না দিলে ব্যাঙ্ক লাটে উঠত তা বলার অপেক্ষা রাখত না। সরকারি বেসরকারি ব্যাঙ্কে এখন আর তা না হলেও, কতগুলি বিষয় নিয়ে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত, ধার দিয়ে ফেরত না পেলে, ব্যাঙ্কগুলির মুনাফা কমে। মুনাফা কমলে অন্তত কিছু ধরনের পুঁজির উপর প্রদেয় সুদ কমতে পারে। লক্ষ্য করে দেখবেন, সেভিংস অ্যাকাউন্টের উপর সুদের হার মোটামুটি এক রকম হলেও, মেয়াদি আমানতের উপর সুদের হার ব্যাঙ্ক ভিত্তিক। অর্থাৎ যে ব্যাঙ্কে পুঁজির ভাণ্ডার যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে, তারা সচরাচর সুদের হার কম রাখে। কারণ, তাদের পুঁজির চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম। যে ব্যাঙ্কে পুঁজির জোগান কম এবং তার কারণ অনেকরকম হতে পারে, যেমন ব্যাঙ্কটি হয়ত প্রাদেশিক ছোট ব্যাঙ্ক, হয়ত উপভোক্তার কাছে ব্যাঙ্কের সুনাম তেমন বেশি নয়, কিংবা ব্যাঙ্কটি কিছু বিষয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে না, সেইরকম ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে সুদের পরিমাণ বেশি পাওয়া যেতে পারে। সহজ হিসেব হল, আমরা কী বিচারে কোন ব্যাঙ্কে কত টাকা রাখছি, আর ব্যাঙ্ক কী বিচারে কাকে কত টাকা ঋণ দিচ্ছে, তার উপরে নির্ভর করবে জমার উপর সুদের হার বেশি না কম, এবং ঘটনাবিশেষে তা বাড়বে, না কমবে। এর থেকে যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ লাভ-ক্ষতি রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সরকারি বা বেসরকারি কোনো ব্যাঙ্কই কিন্তু নিজেদের মুনাফার ক্ষতি করে উপভোক্তার পকেট ভরে দেয় না।

সুতরাং প্রশ্ন হল, আপনি কিসের ভিত্তিতে কোন ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা রাখেন তার নির্ধারক কী কী? সাধারণভাবে বিষয়টি অন্য যে কোনো দ্রব্য কেনাকাটা করার থেকে পৃথক নয়। আমরা কোন কোম্পানির কাপড় কাচা মেশিন কিনব বা জল পরিশুদ্ধ করার যন্ত্র, তার বিচার যেভাবে করে থাকি, অর্থাৎ গুণগত মান সম্পর্কে আমাদের কী ধারণা, কেনার পর পরিষেবা পাওয়া যায় কি না, খারাপ হলে সারানোর খরচ কী রকম, ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে একটি ব্র্যান্ড থেকে অন্যটিকে পৃথক করার মধ্য দিয়ে। কোন ব্যাঙ্ক বড়, সুনামের সঙ্গে টাকা ধার দেয়. সুদ কষার জটিল হিসেবের মধ্যে জলীয় বাষ্প ঢুকিয়ে আরো জটিল করে দেয় না, পরিষেবা পেতে গেলে সারাদিন লাইনে দাঁড়াতে হয় না, ভীষণ বয়স্ক কাউন্টার ক্লার্ক আপনার সঙ্গে অকারণ তর্ক করেন না, পাসবই আপডেট করতে গেলে বেজার মুখ দেখতে হয় না, এরকম নানা কারণের সমাহারে আমরা নির্ধারণ করি আমাদের পছন্দের ব্যাঙ্ক, আর শাখাও। উপরোক্ত উদাহরণগুলো যে নিছক পরিহাস নয় তা যারা ৮০ বা ৯০-এর দশকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চেহারা দেখেছেন তাঁরা সহজেই মনে করতে পারবেন। পশ্চিমবাংলায় এটি আরো বেশি প্রকট হত, কারণ বামপন্থা আমাদের শিখিয়েছিল, মাস মাইনে পাওয়ার জন্য যে হাসিমুখে কাজ করতে হয় তা নির্ভেজাল মিথ্যে কথা। সরকারের দায় হচ্ছে অকর্মণ্য জনসাধারণকে ভাত-মাছে রাখা যাতে ভাত-ঘুম দিয়ে উঠে তারা মার্কসবাদের জয়জয়কার করতে পারে। ভারতে যে বিশাল পরিবর্তন প্রতিদিন দেখতে পাওয়া যায়,

আর যার অনেকগুলোই আমাদের মনঃপূত হয় না, তার কারণ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রগুলোর এই প্রাচীন দুর্বলতা অনেকাংশে দায়ী। যদি রাজনীতির বা কিছু ব্যক্তির লোভের দাস না হয়ে সরকারি ক্ষেত্র নিজেদের সুনাম বজায় রেখে কাজ করে যেত এ দেশে, তা হলে বেসরকারি ক্ষেত্রের দুরাচার আমাদের না-ও দেখতে হতে পারত। বেসরকারি কোম্পানি সারা পৃথিবীতে কিন্তু এই ধরনের ব্যভিচার করতে পারে না --- বেসরকারীকরণের মক্কা আমেরিকাতে বেসরকারি ব্যবসা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কায় থাকে যে পান থেকে চুন খসলে সরকার ব্যবসা করার লাইসেন্স কেড়ে নেবে বরাবরের মতো। আর যে দেশগুলোতে সরকার অতি শক্তিমান, সেখানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর বেসরকারি পুঁজিপতির দাসানুদাস! তবে আমেরিকাতে যে এনরন কেলেঙ্কারি হয় না, তা নয়। ২০০৮-এ অতি সহজে জমি-বাড়ির ঋণ দেওয়া নিয়ে তো বিশ্বব্যাপী মন্দা হয়ে গেল। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, প্রতিষ্ঠানগুলোই অতি দুর্বল। প্রাতিষ্ঠানিক ফাঁক গলে কেমন করে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে থাকে কর ফাঁকি দেওয়ার কিংবা যার প্রাপ্য নয় তাকে ঋণ দেওয়ার তারই জ্বলন্ত উদাহরণ এই মন্দা। অতি সক্রিয় নিয়ন্ত্রকের পক্ষেও প্রতিটি ফাঁক বন্ধ করা একপ্রকার অসম্ভব। একই কারণে, পৃথিবীতে কোনো চুক্তিই কিন্তু সম্পূর্ণ নয়— ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে পারে তার সম্যক আন্দাজ পাওয়া সম্ভব নয় বলেই। স্বয়ং নস্ত্রাদামুস কারো সঙ্গে কোনো চুক্তি করেছিলেন কিনা তা জানা যায় কি? কারণ একমাত্র সেই চুক্তি হয়ত সম্পূর্ণ হয়ে থাকতে পারে!

অনিশ্চয়তার এই রাস্তা ধরে অনেক আগেই ভারতে ঢুকে পড়েছে বিদেশি বেসরকারি ব্যাঙ্ক আর অগুনতি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এমনিতে যারা বিশ্বায়ন, কর্মদক্ষতা, উন্নত পরিষেবা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহী আর এর উপকার পেয়ে থাকেন তাদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর ফলে দেশজ পরিষেবা উন্নত হলে সবারই মঙ্গল। কিন্তু এর একটি অন্য আঙ্গিক রয়েছে, যার ফলে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় কিনা সেই বিষয়টি প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে যায়। দেশের অভ্যন্তরীণ বেসরকারি সংস্থা আর বৈদেশিক অর্থলগ্নি সংস্থা সরকারি ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দিতে পারে, যাতে করে ঋণ দেওয়ার বিষয়টি এই ব্যাঙ্কগুলোর কাছে আগের থেকে অনেক কঠিন আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু বেশি আগ্রহী হয়ে পড়লে ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ পাওয়া যায় না। ঋণ না দিতে পারলে আর প্রচুর পুঁজি ব্যাঙ্কের কুক্ষিগত করে রাখলে বরং সুদ দেওয়ার খরচ অনেক বেশি পড়ে। সুতরাং, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নিজস্ব দুর্বলতা ঢাকতে না পারলে ঋণখেলাপি সংস্থার সংখ্যা যে বেড়ে যেতে পারে, তা বোঝা দুঃসাধ্য নয়। আরও একটি বিষয়ে আলোকপাত করা সমীচীন মনে হয়। যেহেতু ঋণ দান করতে পারলে ব্যাঙ্কের মুনাফা বাড়ে, তাই যে সংস্থা বেশি সুদ দিতে রাজি থাকে তার কাছেই বেশি ঋণ যাবে না কি? কিন্তু কোনো সংস্থা কখন বেশি সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে? এক, যে ব্যবসাটির সঙ্গে তারা যুক্ত, সেটি বেশ ঝুঁকিপ্রবণ আর যে ঝুঁকি সম্বন্ধে ঋণদাতার সম্পূর্ণ ধারণা নেই; দুই, কোনো একটি আইনের ফাঁক সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল, যাতে করে শেষ পর্যন্ত পুরো ঋণ শোধ না-ও করতে হতে পারে। যেমন, বন্ধক রাখা সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণের টাকা শোধ করা ভারতে বেশ দুরূহ ব্যাপার। যে কোনো কোর্ট কেস দশ বছর ধরে চলতে পারে। ভারতে এই ঘটনা নতুন নয়, এর আগেও ব্যাঙ্কের বহু কোটি টাকা শেয়ার বাজারে আইন-বহির্ভূত খাতে লগ্নি হয়েছে আর ব্যাঙ্কের ধার শোধ হয় নি। ব্যাঙ্কগুলো যদি কোনো অবস্থাতেই এই বিষয়টি মাথায় রাখতে না চায়, তাহলে ঋণখেলাপের ঘটনাতে আশ্চর্য হওয়ার অবকাশ থাকে কি? সমস্যা হল, সাধারণ মানুষের টাকা যদি স্রেফ এই কারণে আটকে না যায়, তা হলেও, অন্যদিক থেকে যে ক্ষতি হবে তা অপূরণীয়। সরকার ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কায়েম রাখতে ব্যাঙ্ক পুনরুজ্জীবন খাতে টাকা দিতে বাধ্য হবে, এবং সে ক্ষেত্রে যেটি নিশ্চিতভাবে হতে চলেছে তা হল উচ্চ হারে মুদ্রাস্ফীতি আর সাধারণ মানুষের প্রাপ্য সুদের হার। মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকলে, চাহিদা কমে, ফলে ব্যবসা কমে এবং চাকরির বাজার খারাপ হতে থাকে। তবে সম্পর্কটি একমুখী নয়। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পতনের সময়েও তাই এই সম্পর্ক কিরকম হতে পারে তার একটি ধারণা থাকা উচিত। যেহেতু এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বেশ গভীর, তাই সরকারি পলিসি ও পদ্ধতির আলোচনা জরুরি।

রাজনৈতিক বিশ্বাস অনুসরণ করে অর্থনীতির দিশা নির্ধারণ করার বিষয়টি যথেষ্ট সাবেকি। রাজতন্ত্রের অবসান, যদিও ইওরোপের বেশ কয়েকটি দেশে রাজা-রানীদের নিয়ে উচ্ছ্বাস এখনও চোখে পড়ার মতন, এবং গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র

বা একপেশে একনায়কতন্ত্রের উত্থানে রাজনৈতিক অবস্থান এবং বিশ্বাস সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। গণতন্ত্রে যেভাবে দেশের কাজ নির্বাহ করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেন সাধারণ মানুষ, তার মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে বেশি ছাপ ফেলে। সমাজতন্ত্রে এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যবর্তী পন্থা গণতন্ত্রে রাজনীতির বহুমাত্রিক অবস্থান চোখে পড়ার মতন। রাজনৈতিক পছন্দের বিচারে গণতন্ত্রে নির্বাচিত সদস্যরা তাই হয় মধ্যপন্থী, মধ্যপন্থার বাঁদিকে বা ডান দিকে, অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে সুদূর ডান দিকে বা বাঁদিকে। নির্বাচন সমাপ্ত হলে খুব সহজেই জানতে পারা যায় কত শতাংশ ভোটদাতা ডানপন্থী, বামপন্থী, মধ্যবর্তী বা মধ্যবর্তী পন্থার কিছুটা ডানদিকে অবস্থান করেন, আথবা বাঁদিকে। অর্থনীতির ভাষায় ভোটদাতাদের মধ্যে থেকে এই মধ্যবর্তিনী বা মিডিয়ান ভোটারকে খুঁজে বের করা অন্যতম চিত্তাকর্ষক কাজ। প্রথাগতভাবে, সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে, দেশের মাথাপিছু আয়কে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং তার মধ্যে থেকে সঠিক মধ্যম আয়ের মানুষগুলিকে খুঁজে পাওয়া সহজেই সম্ভব জনগণনার সঙ্গে প্রকাশিত আর্থিক সমীক্ষার মধ্যে থেকে। এখন প্রশ্ন হল, এই জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে তথ্য জেনে রাজনৈতিক লাভ কী? সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় এই বিষয়টি প্রায়ই আলোচনা হয় যে, মধ্য আয়ের জনগণের পছন্দের সারণি সঠিকভাবে দেশের পছন্দের সারণিটিকে ব্যাখ্যা করে এবং এই গোষ্ঠীতে যাার অন্তর্ভুক্ত তারাই নাকি দেশের আর্থিক ক্ষমতা বা অক্ষমতার যথার্থ প্রতিনিধি। যেমন ধরা যাক একটি স্বল্প আয়ের মিডিয়ান ভোটার একজন স্বল্প-আয়ের মানুষই (বা অনেক মানুষ) হবেন। ভয়ানক বড়লোক কেউ মিডিয়ান ভোটার হবেন না সে দেশের আয়ের নিরিখে। বস্তুত পৃথিবীর সবকটি দেশেই অতি ধনী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী কোনোভাবেই মিডিয়ান ভোটার হন না।

সুতরাং উপরের যুক্তিতে ফিরে গেলে বলা যেতে পারে যে, এই মধ্যবিত্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে যে ধরনের আর্থিক সংস্থান এবং প্রয়োজন রয়েছে, তার ভিত্তিতেই সরকার আর্থিক পলিসিগুলো নেওয়ার প্রয়াস করে থাকেন। অর্থাৎ, একটি গরিব-প্রধান দেশে যদি এমন কোনো নীতি গ্রহণ করা হয়, যাতে গরিবের ক্ষতি হয় এবং গরিব মিডিয়ান ভোটারের পছন্দের সারণির সঙ্গে তার অমিল প্রচুর, তবে রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধ ঘটে অবশ্যম্ভাবীভাবেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বিরোধ এড়ানো সম্ভব হয় যদি রাজনৈতিক দল ধীরে ধীরে অপছন্দের পলিসি তৈরির আগে তার প্রেক্ষাপটটি বিশদে আলোচনা করে রাখে। অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না, কারণ আর্থিক সংস্কারের বিষয়ে সরকারকে চট্‌জলদি সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।

রাজনৈতিক দল এবং সরকারের 'এলিট ক্যাপচার' বা অভিজাতদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে আমরা অনেকেই ওয়াকিবহাল। শোনা যায়, আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া এবং বহু উন্নয়নশীল দেশেই উচ্চবর্গীয় এবং স্থানবিশেষে উচ্চবর্ণের মানুষের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সাধারণত সঠিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করুন, ভারতের মতো দেশে রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটি নীতি হতে পারে বেশ কিছু দ্রব্যের দেশজ উৎপাদন বন্ধ করে শুধুমাত্র বিদেশ থেকে তা আমদানি করা। অন্তত অর্থনীতির সঠিক তত্ত্ব তাই বলবে। কিন্তু তা কি সম্পূর্ণভাবে সম্ভব? দেশে যে আমদানি-বিকল্প দ্রব্যগুলি উৎপাদিত হয়, তার সঙ্গে যেমন বহু সাধারণ কর্মচারি যুক্ত থাকেন, তেমনই পুঁজিনিয়োগ করে থাকেন তাবড় শিল্পপতি। আমেরিকার প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি টেক্সাসে তৈল শোধনাগারের মালিক ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি থাকার সময়েই। সুতরাং এই জাতীয় পুঁজিপতি বা শিল্পপতিরা যে নিজের নিজের সুবিধার্থে সরকারি পলিসিতে হস্তক্ষেপ করতে চাইবেন, তা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আমেরিকাতে বিজনেস লবি এতটাই শক্ত এবং উদ্যমী যে তাদের ইচ্ছা অনুসারে একের পর এক পলিসি, মায় যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত আবর্তিত হয়। ভারতেও আমদানি শুল্ক কতটা আরোপিত হবে একটি দ্রব্যের উপর, তার নীতি নির্ধারণে দেশজ শিল্পপতিদের ভূমিকা স্মরণীয়। দেশের মদিরা উৎপাদকদের মধ্যে অন্যতম বিজয় মাল্য একসময় বিদেশি মদের উপর উচ্চ হারে কর আরোপ করার বিষয়ে প্রচুর লবি করেছেন সরকারি দপ্তরে। তিনিই আবার পরবর্তীকালে স্কটল্যান্ডের একটি কোম্পানি কেনার পর সরকারের কাছে লবি করতে থাকেন বিদেশি মদের উপর থেকে শুল্ক-হার কমিয়ে দিতে। কারণ? এই কোম্পানি যাতে সস্তায় বিদেশি মদ ভারতে আমদানি করতে পারে আর দেশের নিশ্চিত বাজারটি সহজে দখল করতে পারে। শুল্ক-হার কমালে তাতে সব বিদেশী মদ প্রস্তুতকারকেরই সুবিধা ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে, কিন্তু যেহেতু বিজয় মাল্যর কোম্পানিটি আদতে এই দেশেরই, ফলে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে

অনেকটাই। অন্তত বাজারে চলতি একটা ব্র্যান্ড যে সুবিধা পেয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তেমনটি হওয়া সম্ভব। প্রশ্ন হল, এ তো গেল ব্যবসায়িক পদ্ধতির কথা, এর মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়টি কোথায়? আমদানি শুল্ক এবং এই ধরনের সিদ্ধান্ত আসলে অনেকটাই নির্ভর করে সরকারের রাজনৈতিক বিচার এবং আসক্তির উপর। এবং সেই আসক্তির মূল্যায়ন করে বড় শিল্পপতিরা পার্টির তহবিলে অনুদান দিয়ে থাকেন প্রয়োজনমতো। কোটি কোটি টাকার নির্বাচনী প্রচার হয় কেমন করে যদি দলের তহবিল মজবুত না হয়? শুধুমাত্র দলীয় কর্মীদের অনুদানে এত দলীয় কর্মযজ্ঞের আয়োজন করা যায় কি? যে ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা অনুদান দিয়ে থাকেন, তাঁরাও কি শূন্য হাতে ফিরে যাবেন? সুতরাং এই সবের সমন্বয়ে খুব সহজেই সহজ সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিকভাবে রঙিন হয়ে পড়ে। এইরকম আরো অসংখ্য বিষয়েই রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক বিশেষ গভীর। যেহেতু আর্থিক সংস্কারের অনেকটা জুড়ে থাকে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেই বিষয়টি সুতরাং বহুজাতিক সংস্থাক লবি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাক আদেশ এবং মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে একটি দেশ আবার সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে এখন অপারগ। এর মধ্যে কোন দেশ উত্তর আমেরিকার চাপের কাছে মাথা নত করছে ব্যবসায়িক কারণে আর কারা চীন-জাপান, রাশিয়ার কাছে, তার মধ্যে মিশে রয়েছে বিরাট আন্তর্জাতিক রাজনীতি। ফলে যে কোনো সরকারের কাজটি যে ভয়ানক রকম জটিল হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত এবং এই ঠাণ্ডা-যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও যে তা রীতিমতো অস্বস্তিদায়ক হতে পারে তার উদাহরণ ইরান, কিউবা, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি দেশগুলি। মধ্য প্রাচ্য এবং আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখলে আমেরিকার বিরাগভাজন হতে হয় অনেককেই। অথচ আমেরিকা থেকে বিদেশী মুদ্রা আসে, ব্যবসা আসে, ফ্রান্স-জার্মানি থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়, প্রযুক্তি পাওয়া যায় উন্নতমানের।

এরকম বৈদেশিক ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের টাকা ধার দিয়ে কৃতার্থ বোধ করে বহু ব্যাঙ্ক। সরকারি অর্থমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রক থাকুক বা না থাকুক, ব্যাঙ্কের নিজস্ব অডিট এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অডিট দুই-ই কিন্তু সহজেই জানাতে পারে যে ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হয়েছে কিনা। ঘোষিত যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অডিট বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। তাহলে সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি খুঁজে বের করার দায়িত্ব বর্তায় নিজস্ব অডিটের উপর, আর কে না জানেন যে অডিট প্রক্রিয়ার দোষে (বা অর্থের বিনিময়ে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার খেলায়) বহু সংস্থা কর ফাঁকি আর তথ্য গোপন একই সঙ্গে করে যেতে পারে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা নিশ্চয় খুব গুণী মানুষ, কিন্তু এঁদের নীতিজ্ঞান এ বিষয়ে ব্যবহৃত হবে তেমন মনে করার কারণ নেই। বড় ব্যবসা কিংবা গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণ হিসেব রক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হলে এই ধরনের ফাঁকি অস্বাভাবিক নয়। অথচ, আর্থিক সংস্থা যদি ঋণ দেওয়ার বিষয়ে খুব বাছবিচার করে আর ছোট-মাঝারি সংস্থাকে ধার দিতে অনিচ্ছুক হয়, তা কদাচিৎ অডিট আলোচনায় প্রকাশ পায়। যে পরিমাণ ঋণ বড় ব্যবসা সহজে পায় আর নয়ছয় করে, তা ক্ষুদ্রশিল্পে নিয়োজিত হলে কর্মসংস্থান বাড়ত কয়েকশো গুণ। ভারতের মতো দেশে এর আর্থিক গুরুত্ব নিশ্চয় নতুন করে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না।

ব্যাঙ্কগুলো কোনো পরিস্থিতিতেই এই সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে খুব আগ্রহী নয়। সব মিলিয়ে এমন ভরসা পাওয়া শক্ত যে অচিরেই এই ধরনের সমস্যা ভারতে মিটে যাবে এবং তুলনামূলকভাবে দরিদ্র আমানতকারীর জমানো অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে। এর জন্যে যথাযথ আইনি ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। **উ মা**

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বর:** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

দামোদরের বুকে চোরাবালি

তপোব্রত সান্যাল

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুপঠিত 'চোরাবালি' গল্পে চোরাবালি কী, তার আভাস পাওয়া যায়। গণিতপ্রিয় হরিনাথ মাস্টারের অনুসন্ধানী চোখে যখন বৃদ্ধ দেওয়ানের জমিদারির হিসেবের কারচুপি ধরা পড়ে, তখন ধূর্ত দেওয়ান জমিদারির একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত চোরাবালিতে হরিনাথকে কৌশলে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণ হরণ করে। আসলে চোরাবালি এমনই অস্থিত ভূমি যেখানে কঠিন বস্তু মাটির গভীরে হারিয়ে যায়। চোরাবালির ইংরেজি প্রতিশব্দ— Quick sand।

সম্প্রতি দামোদর নদের কয়েকটি জায়গায় চোরাবালির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। স্বভাবতই সাধারণের মনে প্রশ্ন— এমন হওয়ার কারণ কী? দামোদরের গর্ভের মাটির কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যই কি এর মূলে? বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

প্রথমেই বলে রাখি, মাটির আচরণের কারণ কেবল মৃৎ-প্রকৃতিই নয়, মৃৎকণার ফাঁকে ফাঁকে জলকণার অস্তিত্ব ও মাত্রাই ঠিক করে দেয় মাটির আচরণ কেমন হবে। মৃৎ-প্রযুক্তি বিদ্যার পথিকৃৎ কার্ল টারজাঘি (Karl Terzaghi) বলেছেনঙ্ক ...'Difficulties with soils are almost exclusively due not to the soils themselves, but to the water contained in their voids.'... (1939)

মাটির কণার ফাঁকফোকর দিয়ে ভূগর্ভস্থ জল (ground water) পথ করে নিয়ে সচল থাকে। মাটির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে থাকা জল এর ফলে মাটির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। একে বলা হয় pore-water pressure অর্থাৎ রন্ধ্রস্থ জলের চাপ। ফলে, মাটির কণাও সুস্থির থাকে না। মাটির অভ্যন্তরে গতিশীল ভূ-জলের প্রবাহ আবার নানা ধরনের হতে পারে। কখনো বা তার প্রবাহ সুশৃঙ্খল (laminar flow), কখনো বা বিশৃঙ্খল (turbulent flow)। প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে যানবাহন যখন সুশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের সমান্তরালে নির্দিষ্ট বেগে চলে, তখন সেই অবস্থার সঙ্গে সুশৃঙ্খল প্রবাহের তুলনা করা চলে। অন্যদিকে রাজপথ দিয়ে যানবাহনের যথেচ্ছ এঁকে-বেঁকে চলাকে বিশৃঙ্খল প্রবাহ বলা যায়। যেমন অনেক সময়ে বিভিন্ন বড় রাস্তার মোড়ে দেখা যায়। এদিকে বাস, ওদিকে অটোরিকশা, সাইকেল, ট্যাক্সি- কে যে কোনদিকে যাবে ঠিক নেই। আবার, মাটির অভ্যন্তরে জলের প্রবাহ কখনো বা একমাত্রিক (one dimensional), কখনো বা দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিকও হতে পারে। ফরাসি প্রযুক্তিবিদ ডার্সি (Darcy) ভূ-জলের প্রবাহের মাত্রা নির্ধারণে যে পরীক্ষালব্ধ সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, তা আজও মেনে চলা হয়। ঐ সূত্রানুসারে মাটির নিচের বয়ে-চলা ভূ-জলের বেগ জল-সম্পৃক্ত নির্দিষ্ট আয়তনের মাটির জল-পরিবাহিতা (hydraulic conductivity) এবং ঔদক নতির (hydraulic gradient) গুণফলের সমানুপাতিক।

মাটির জল-পরিবাহিতা নির্ভর করে মূলত মাটির ভেতরের ফাঁকগুলির আয়তন, রন্ধ্রগুলির অবস্থান অর্থাৎ তারা বিচ্ছিন্ন, না নিরবচ্ছিন্ন (continuous), মৃৎকণার ব্যাস ও আকার এবং অমসৃণতার (roughness) ওপর। মাটির জল-পরিবাহিতা, আসলে, মাটির জলপ্রবাহের সুগমতার নির্দেশক। দেখা গিয়েছে, মাটির রন্ধ্রের গড় ব্যাসের বর্গ জল-পরিবাহিতার সমানুপাতিক। মোট কথা, ভূজলের গতির মাত্রা নির্ভর করে মাটির ভেতরের ফাঁকগুলির আকার, আয়তন ও অবস্থানের ওপর এবং সেইসঙ্গে ঔদক নতি গতির মাত্রার ক্ষেত্রে সম্পূরকের কাজ করে। ফাঁকগুলি যদি একটানা হয়, আকারেও হয় অপেক্ষাকৃত বড়, তবে ভূজলের প্রবাহের মাত্রা বেশি হয়। ঔদক নতি হল ভূজলের কোনো নির্দিষ্ট উৎস থেকে গন্তব্যস্থলের ঢাল (gradient)। বলা বাহুল্য, ভূজলের গতি যত বেশি হবে, মাটির ওপর রন্ধ্রস্থ জলের চাপও সেই অনুপাতে বাড়বে। এর ফলে মাটির ওপর এক ধরনের টান (drag force) তৈরি হয়। প্রাযুক্তিক ভাষায় একে বলা হয় seepage force বা অভিস্রবণ-জনিত বল। রন্ধ্রস্থ জলের চাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিস্রবণ-জনিত বল ক্ষেত্রবিশেষে ভূ-জলকে ওপরের দিকে ঠেলে তুলে দিতে পারে, যদি নিচের দিকে ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজনিত বল ও

অন্যান্য মাত্রা ঊর্ধ্বগামী অভিস্রবণজনিত বলের পরিমাণের চেয়ে কম হয়। এ-সব ক্ষেত্রে মৃৎ-প্রকৃতিরও ভূমিকা থাকে। ভূ-গর্ভের কোনো জায়গার মাটিতে যদি বালির পরিমাণ বেশি থাকে এবং মাটির কণাগুলি ছাড়া ছাড়া অবস্থায় থাকে, তবেই এমনটা হওয়া সম্ভব। মোটা দানার বালির চেয়ে মিহি দানার বালিতে এমন সম্ভাবনা বেশি। অসংবদ্ধ ও জলসম্পৃক্ত (saturated) বেলে মাটির আচরণ অনেকটা ভারী তরল পদার্থের মতো। প্রাযুক্তিক পরিভাষায়, মাটির এমন অবস্থার নাম liquefaction বা তরলীভবন।

দামোদর নদে চোরাবালির তত্ত্ব বোঝাতে প্রাযুক্তিক কচকচি এড়ানো গেল না। এবার দামোদর নদে চোরাবালির প্রসঙ্গে আসি। দামোদর অনিয়তপ্রবাহী নদী। এ দিয়ে জল একইভাবে প্রবাহিত হয় না। বর্ষায় জলে টইটম্বুর, ভয়ঙ্কর। অন্যসময় ক্ষীণতোয়া, জল নেই বললেই চলে। কবিগুরুর সেই 'আমাদের ছোটনদী'র মতো। বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে/ পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি।'... এমন নদীতে ঔদক নতির মাত্রা সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। ফলে, অভিস্রবণজনিত বল দামোদরের গর্ভতলের নিচের মাটিতে বেশি। এমন অবস্থায় মাটির জলসম্পৃক্ত হবার সম্ভাবনাও তুলনায় বেশি। যে-সব জায়গায় গর্ভের নিচের মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি, সেখানে মাটির তরলীভবনের সম্ভাবনাও তাই বেশি। সে যেন মাটিগোলা জল। আপাতভাবে দেখলে মাটি বলে মনে হয়, আসলে তা নয়। তরলীভূত এই মাটি আর সাধারণ মাটির মতো নয়, সে তার ভার বহনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তার ছেদন-শক্তি (shear strength) থাকে না বললেই হয়। পুকুরে পাঁকের ক্ষেত্রে যেমন হয়, ভারী কঠিন বস্তু সেখানে পড়লে তা নিচে তলিয়ে যায়। পতনের গভীরতা নির্ভর করে কত নিচে কঠিন মাটির স্তর আছে তার ওপর।

কেন দামোদরের গর্ভের বিশেষ বিশেষ জায়গায় চোরাবালি দেখা যাচ্ছে, তার কারণ বিশ্লেষণের জন্য দামোদর নদের গর্ভের নিচের মৃৎ-পরিবেশ (soil profile) জানা জরুরি। আমার কাছে এ-তথ্য নেই। দামোদরের গর্ভ থেকে বালি তোলার ফলে ঊর্ধ্বগামী অভিস্রবণ-জনিত বল এবং রন্ধ্রস্থ চাপ উন্মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

চোরাবালি প্রতিরোধ করার একটা উপায়ই আছে। সেটা হল মাটির মধ্যে জল যাতে অবরুদ্ধ না থাকে এবং ওপরে ঠেলে উঠতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। যেসব মাটিতে বালির প্রাধান্য, সেখানে নুড়ির (gravel) আস্তরণ দেওয়ার কথাও পাশাপাশি ভাবা যেতে পারে। আসলে সমস্যার সমাধান নির্ভর করে তার কারণ নির্ধারণের ওপর। চোরাবালির উৎপত্তির সাধারণ কারণগুলির একটা আভাস ওপরে দেওয়া হল। ক্ষেত্রবিশেষে এর সামান্য হেরফের হতে পারে। দামোদরের বুকে যে সব জায়গায় চোরাবালি পাওয়া গিয়েছে সে-সব জায়গা অবিলম্বে চিহ্নিত করে রাখা উচিত, অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত নির্বিচারে বালি তোলা। দামোদরের গর্ভের নিচের মৃৎ-পরিলেখ প্রস্তুত করাও জরুরি। এর পরে ভাবা যাবে বাস্তব সমাধানের পথ। কীভাবে কোন পথে গর্ভতলের নিচে অবরুদ্ধ জল অন্য পথে চালনা করা যায়, কোথায়ই বা বিছানো যেতে পারে নুড়ির আস্তরণ— সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত সমস্যার উৎস ও কারণ অনুসন্ধানের পর নেওয়াই সমীচীন। চোখ বন্ধ করে রাখলে বিপদ এড়ানো যাবে না। **উ মা**

উৎস মানুষ

নজর রাখুন

নতুন ওয়েবসাইটে

আরও আধুনিক চেহারায় হাজির

হচ্ছে পত্রিকা।

লগ অন করুন

utsomanus@gmail.com

https://www.facebook.com/utsomanus/

ফেসবুকেও হাজির আমরা

গুগল সার্চে বাংলায় 'উৎস মানুষ' কথাটা

লিখলেও হবে

কোনটা চাই– চিনির বিকল্প, না মিষ্টির বিকল্প

গৌতম মিস্ত্রী

চিনির অপকারিতা আর অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে উৎস মানুষ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এবারে স্বাদ হিসাবে খোদ মিষ্টির সম্বন্ধে কিছু তিক্ত কথা বলা যাক। স্যাকারিন, সুগার-ফ্রি, ডায়েট কোক ইত্যাদির আপাতনিরীহ মুখোশের পিছনে যে বিষ মিষ্টিমুখ নিয়ে লোভ দেখায়, তা খোলার চেষ্টা করব। যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, তাঁরা মিষ্টি খাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকাকে বিধাতার এক চরম অভিশাপ মনে করেন। আর তাঁদের প্রলুব্ধ করতেই মিষ্টির দোকানে কাচের আলমারিতে 'ডায়াবেটিক সন্দেশ' নামে সাদা শয়তান প্রলোভন দেখায়। সেই সব শয়তানও থাকবে সন্দেহের তালিকায়।

ডায়াবেটিস রোগের বাড়বাড়ন্তে আজকাল চিনির বিকল্প ব্যবসার এক নতুন উপকরণের সন্ধান দিয়েছে। ডায়াবেটিস রোগীদের নিশানা করে ছাপা খবরের কাগজের পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দেখে ঘাড়ের ওপর ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিসের শ্বাসপ্রশ্বাস টের পাওয়া যায়। কেবল ডায়াবেটিসের কথাই বা কেন বলি? মাঝবয়স উত্তীর্ণ হলেই চেহারায় যে ভারিক্কি ভাব এসে যাচ্ছে আজকাল, মানে না চাইলেও তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না, তাদের অধিকাংশই কিন্তু চাইলেই মিষ্টিপ্রীতি ত্যাগ করতে পারছে না। ফলে মিষ্টিমুখ করার বাসনা ষোলআনা। তাই ক্ষেপার পরশমণির খোঁজার মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে চিনির বিকল্প কিছু মিষ্টির। এই চাহিদাকে মূলধন করে চিনির বিকল্পের সন্ধান শুরু হয় গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই। ব্যবসায়ীরা এমন সুযোগ হাতছাড়া করার ঝুঁকি নেয় নি। একের পর এক চিনির বিকল্প মিষ্টি মিষ্টিপ্রিয় মানুষের মিষ্টি-নেশায় কুলোর বাতাস দিয়ে গেছে। মিষ্টি স্বাদের বিকল্পের অনুসন্ধান চিনির বিকল্পের খোঁজে আটকে গেছে। আমাদের মধ্যে মিষ্টি-স্বাদের নেশা থেকে গেছে, মিষ্টি ছাড়া খাবারদাবার উপভোগ করার অনুশীলন ও খাদ্যরুচির পরিবর্তনের সংস্কৃতি পাত্তা পায় নি।

ডাক্তারের বারণে বা নিজের ভালো করার স্বেচ্ছা তাগিদে মিষ্টির দোকানে ঢুকে ডায়েট কোক সহযোগে ডায়াবেটিক সন্দেশ খেয়ে ভাবি, দারুণ স্বাস্থ্যরক্ষা হল! সত্যিই হল কি? চায়ের কাপে আর পায়েসে চিনির বদলে স্যাকারিন, ব্রাউন সুগার বা হাল ফ্যাশনের সুগার-ফ্রি দিলে সত্যিই কি নিজের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

চিনি আমাদের প্রিয়, কারণ এই রাসায়নিক বস্তুটি আমাদের জিহ্বার উপরে অবস্থিত প্রান্তিক স্নায়ুকোষ ও স্বাদকোরকগুলিকে (nerve-ending, taste receptor, taste-bud) উত্তেজিত করে মিষ্টির অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায়। এই কাজটি অবশ্য চিনি ছাড়া আরও কয়েকটি খাবারযোগ্য রাসায়নিক করতে পারে। চিনিকে, যার রাসায়নিক নাম সুক্রোজ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে আমরা পাব আমাদের চেনা দুটি রাসায়নিক পদার্থ— গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ। এই দুটিই সরল শর্করা যার মধ্যে শেষেরটি চিনির মিষ্টত্বের কৃতিত্বের দাবিদার। গ্লুকোজ যতটা না মিষ্টি তার চেয়ে বেশি তেতো। মিষ্টি-প্রিয় মানুষও বিশুদ্ধ গ্লুকোজের সরবত পান করতে পছন্দ করেন না বলে বাজারি 'তাৎক্ষণিক শক্তির' (এটি আর একটি ভাঁওতা বটে) প্যাকেট-জাত গ্লুকোজে স্বাদবর্ধক কমলালেবুর কৃত্রিম রং ও গন্ধ মেশাতে হয়। অর্থাৎ ফ্রুক্টোজের মিষ্টির জন্য চিনি আমাদের প্রিয় হলেও চিনির সাথে অনুষঙ্গ হিসাবে আমাদের গ্লুকোজ খেতে হচ্ছে। এটাও আবার ঠিক যে, আমাদের শরীরের রোগভোগ ঐ ফাউ হিসাবে খাওয়া গ্লুকোজেরই জন্য, ফ্রুক্টোজ আপাতদৃষ্টিতে নির্বিষ।

এটা উপলব্ধির পরেই চিনির বিকল্প হিসাবে একদম প্রথমের দিকে ফ্রুক্টোজ বেশ কিছুকাল বিকল্প মিষ্টির বাজার দখল করে রেখেছিল। তবে সেটাই একমাত্র বিকল্প হিসাবে বাজার দখল করে রাখতে পারে নি। এসেছে সরবিটল, ম্যানিটল ইত্যাদি অন্যান্য প্রাকৃতিক শর্করা। চিনির বিকল্প হিসাবে একটার পর একটা প্রচুর গ্লুকোজবিহীন অথবা গ্লুকোজ নিষ্কাশিত প্রাকৃতিক মিষ্টি মিষ্টিপ্রিয় মানুষের জিভের ডগায় মিষ্টি সুড়সুড়ি দিয়ে আবেদন-নিবেদন করে গেল— স্থায়ীভাবে

টিকতে পারল না এগুলোর কোনটাই। ক্ষতিসাধনের অনুষঙ্গ ছাড়া নিরাপদ মিষ্টি স্বাদের খাবারদাবার কেবলমাত্র হাল্কা-ফুল্কা মিষ্টি তাজা ফলমূলের ঝুড়ির বাইরে বেরোতে পারল না। আমরা জানি, ফলের মিষ্টি স্বাদ তার ফ্রুক্টোজের অবদান। তাজা ও ফলের সঙ্গে প্রচুর জল, তন্তু (ফাইবার), খনিজ পদার্থ আর ভিটামিন থাকে যেটা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারীও বটে। ফল নিংড়ানো রসে বা বোতল-বন্দি ফলের বাণিজ্যিক খাদ্য-পানীয়ে অবশ্য এই উপকার আশা করতে নেই।

চিনি বা মিষ্টি স্বাদের মূল রাসায়নিকটিকে খুঁতখুঁতে খাদ্যবিশারদগণ আবার খাদ্য বলতেই নারাজ। চিনিকে খাদ্য না বলে জিরে, লঙ্কা বা নুনের মতো মশলা বা রাসায়নিক বলে দেগে দেন। বলেন, খাদ্য হতে গেলে ন্যূনতম যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা উচিত, যেমন তন্তু, খনিজ পদার্থ বা ভিটামিন এসব কিছুই নেই চিনিতে। চিনি কেবলই ফাঁকা শক্তি বা এম্পটি ক্যালোরির আধার। এমনিতেই ধনী-গরিব নির্বিশেষে আমাদের দেশের খাবারের থালায় নানান রূপে শর্করাই প্রধানত বিরাজ করে— ধনীদের ক্ষেত্রে অজ্ঞানতার কারণে আর গরিবের ক্ষেত্রে অন্য উপায়ের অভাবেও। তার উপরে চিনি নিছকই গোদের ওপরে বিষফোড়া স্বরূপ।

উন্নত দেশগুলিতে প্রথমের দিকে চিনির বিকল্প সন্ধানে প্রথমেই ফ্রুক্টোজকে নিশানা করে ভুট্টা থেকে 'কর্ন সিরাপ' ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ কম গ্লুকোজের মিষ্টির পণ্য বাজার দখল করে রেখেছিল ১৯৬০ সাল থেকেই। এর পরে গম, ট্যাপিওকা, আলু ইত্যাদি বিভিন্ন জটিল শ্বেতসার থেকেই ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ পানীয় ও খাবারকে মিষ্টি করার হরেক রকমের 'রাসায়নিক' বা 'মশলা' তৈরি করা হতে লাগল। এই সমস্ত কাঁচামালের গ্লুকোজকে 'ডি-জাইলোজ আইসোমারেজ' নামে একটি উৎসেচক দিয়ে ফ্রুক্টোজকে রূপান্তরিত করা হত। মজার কথা, কৃত্রিম উপায়ে গ্লুকোজ কমানো ও ফ্রুক্টোজ সমৃদ্ধ এই রাসায়নিককে কোনো কোনো ব্যবসায়িক সংস্থা আবার 'গ্লুকোজ সিরাপ' নামেও বিক্রি করত। কারণ চিনির বিকল্প তখন স্বাস্থ্য সচেতন ক্রেতার কাছে তত আবেদনের হয়ে ওঠে নি। গ্লুকোজের চেয়ে ফ্রুক্টোজের অতি মিষ্টত্ব দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির ছদ্মনামে ব্যবহার করে বাজারে আসতে হত। এইভাবে ফ্রুক্টোজ পানীয়ের যথেচ্ছ ব্যবহারের মাত্রা প্রথাগত চিনি বা সুক্রোজের ব্যবহারকেও অবিশ্বাস্যভাবে ২১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেল। এতে খাদ্যে তন্তু ব্যবহারের মাত্রা ৪০ শতাংশ কমে গেল, স্থূলতা এবং ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব ক্রমেই বেড়ে যেতে দেখা গেল।[১] এই রোগভোগের বৃদ্ধির কারণ কেবল খাদ্যের 'কালোরি না তন্তু' এই বিশ্লেষণের হিসাবে আর আটকে রইল না। কৃত্রিম মিষ্টির প্রভাবে খাবারে স্বাদ বেড়ে যাওয়ায় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার খাওয়ার প্রবণতা আটকানো দুষ্কর হয়ে পড়ল। যাঁরা ডায়েটিং বা সচেষ্টভাবে খাবারের পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে দেখেছেন তাঁরা হাড়ে হাড়ে জানেন, মুখে ও জিভে লাগাম টানা কতটা দুরূহ। নিমন্ত্রণ বাড়ির ভূরিভোজের আবেদন ঠেকানো কতটা আয়াসসাধ্য। তাই আপাতদৃষ্টিতে ফ্রুক্টোজ নিরীহ মনে হলেও এটা ক্ষতিকারক নয় তেমনটি প্রমাণ করা যায় নি।

আমেরিকার কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ামক সংস্থা বোতলবন্দি ফলের রসসহ সকল মিষ্টি পানীয়কে আস্বাস্থ্যকর বলে বলছেন, এগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারে ওজন, রক্তচাপ ও রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে, ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। এসবের বদলে তন্তুসহ তাজা ফল খেতে ও পরিস্রুত জল পান করতে পরামর্শ দিচ্ছে ঐ নিয়ামক সংস্থা।[২-৫]

ফ্রুক্টোজ, সরবিটল, ম্যানিটল ইত্যাদি বিনা গ্লুকোজের মিষ্টি রাসায়নিক প্রায় শূন্য ক্যালোরি বিশিষ্ট হলেও এই কৃত্রিম মিষ্টিগুলি লিভারে বিক্রিয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে পাইরুভেট, ল্যাক্টিক অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার ইত্যাদির মধ্যবর্তী রাসায়নিকের পথ বেয়ে অন্তিমে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড, ইনসুলিন ও ঘুরপথে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা বাড়িয়ে ক্ষান্ত হয়।[৬] ১৯১২ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ৪২৮৮৩ জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের উপরে চালানো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গড়পড়তা সপ্তাহে ৬.৫ বোতল মিষ্টি পানীয় (প্রধানত চিনির বিকল্প কৃত্রিম মিষ্টি মেশানো) পানীয় পান করতেন এমন মিষ্টি-প্রিয় মানুষের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছিল।[৭]

খাদ্য-পানীয় ওষুধপত্র ইত্যাদি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে মান্যতার জন্য আমরা যে দেশের আইনকানুনের দিকে তাকিয়ে থাকি, সেই দেশে অর্থাৎ আমেরিকায় চিনির বিকল্প হিসাবে যে ভক্ষণযোগ্য বস্তুগুলির চল আছে সেগুলিকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক। চিনি বা সুক্রোজও একটি প্রাকৃতিক মিষ্টি বটে।

ক্যালোরির আধিক্যের জন্য ও অত্যধিক বেশি গ্লাইসেমিক ইনডেক্সের জন্য চিনির মধ্যেকার গ্লুকোজ চিনিকে ভিলেন হিসাবে দেগে দিল। ফলে অনুসন্ধান চলল গ্লুকোজবিহীন মিষ্টি স্বাদের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিকের। প্রাকৃতিক বিকল্প মিষ্টিগুলির প্রবর্তন প্রথমদিকে জনপ্রিয় হলেও বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে প্রস্তুত বিকল্প মিষ্টিই বাজার অধিকার করে নিল, কারণ সেইগুলির মিষ্টত্ব অনেকগুণ বেশি ও সস্তা। জৈব উপায়ে প্রস্তুত প্রাকৃতিক চিনির বিকল্প হিসাবে ফ্রুক্টোজ, সরবিটল, জাইলিটল, ম্যানিটল ও ল্যাক্টিটল ইত্যাদি 'সুগার-অ্যালকোহল' বা 'পলিওল' (poyol)-এর সন্ধান সর্বপ্রথম পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে মিষ্টি পানীয় ইত্যাদিতে এগুলোর ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হল না। তাই বর্তমানের চিনির বিকল্প মিষ্টি মানেই রসায়নাগারে প্রস্তুত বিকল্প মিষ্টি, যেগুলোর মিষ্টত্ব চিনির চেয়ে দুশো থেকে কুড়ি হাজার গুণ বেশি। এমন ছয়টি রাসায়নিক পানীয় ও খাদ্যে ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র পেয়েছে ধ্ব এস্পারটেম (aspertame), সুক্রালোজ (sucralose), নিওটেম (neotame), আসিসালফেম-পটাশিয়াম (Ace-K), স্যাকারিন (saccharin) ও অ্যাডভান্টেম (advantame)।

কালের ফেরে রাসায়নিক স্যাকারিন (বেঞ্জোইক সালফিমাইড) এখন মিষ্টির বিকল্প হিসাবে অতটা জনপ্রিয় নয়, যদিও এটাই আমাদের দেশে প্রথমদিকে স্বাস্থ্য সচেতন সচ্ছল নগরবাসীর কাছে একমাত্র চিনির বিকল্প ছিল। এটি সমপরিমাণ চিনির চেয়ে ৭০০ গুণ মিষ্টি এবং মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে কিঞ্চিৎ তেতো। স্যাকারিনের মিষ্টি-মধুর শয়তানি আবেদন ইংরেজি ডিকশনারিতে 'মিষ্টি মুখোশের আড়ালে শয়তান'-এর ব্যঞ্জনায় একটি ইতর ভাববহনকারী শব্দ হিসাবে আখ্যা পেয়ে গেল। গ্রীক শব্দ 'sakcharon' (ইংরেজিতে প্রতিশব্দ gravel— অর্থাৎ রুক্ষ কর্কশ পাথর) থেকে স্যাকারিন শব্দের উৎপত্তি। অস্বস্তিকরভাবে অতিরিক্ত মিষ্টি বা আপাতনিরীহ ভাবের প্রকাশে স্যাকারিন শব্দের চল আছে। চিনির পরিবর্তে ভারতবাসীর প্রিয় মিষ্টি রসনার সাধ-আহ্লাদ পূরণ করার কল্পে স্যাকারিন রাসায়নিকের প্রথম প্রবেশ হলেও এটির আবির্ভাবের গল্পটি নাটকীয় ও কাকতালীয়।

১৮৭৯ সালে নিউ ইয়র্কের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কন্সট্যান্টিন ফালবার্গ আলকাতরার রাসায়নিক বিশ্লেষণের সময়ে কাকতালীয়ভাবে স্যাকারিনের মিষ্টত্ব আবিষ্কার করে বসেন ও তড়িৎগতিতে এর পেটেন্ট নিয়ে নেন। পরবর্তীকালে খুঁতখুঁতে বৈজ্ঞানিকগণ স্যাকারিনের প্রভাবে ইঁদুরের মূত্রাশয়ে ক্যান্সারের সম্ভাবনার কথা জানান, যদিও মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিণামের কোনও প্রমাণ মেলে নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চিনির আকালের সময়ে স্যাকারিন মি. কন্সট্যান্টিন ফালবার্গের ব্যবসাকে বিশাল আর্থিক লাভ এনে দেয়। বহু টানাপোড়েন ও স্যাকারিনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সত্ত্বেও এটি বাজারে টিকে গেল।

অ্যাস্পারটেম এমনই আর একটি মিষ্টি রাসায়নিক যার আবিষ্কারও স্যাকারিনের মতো নাটকীয়। পাকস্থলীর প্রদাহ বা আলসারের ওষুধ আবিষ্কার করার সময় বৈজ্ঞানিক জেমস এম স্ক্লাটার, ১৯৬৫ অ্যাস্পারটেম নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করার সময়ে তার আঙুলে এই বস্তুটি লেগে যায় ও তিনি আঙুলটি চুষে দেখেন এটি চিনির চেয়ে প্রায় দুশো গুণ মিষ্টি। চিনির বিকল্প হিসাবে অ্যাস্পারটেম এখন ডাইনিং টেবিলে চায়ে মেশানোর জন্য শোভা পায়; আইসক্রিম, ঠাণ্ডা ডেজার্ট, জিলাটিন, মিষ্টি পানীয় ও চিউয়িংগামে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রক্রিয়াকৃত খাবারে সর্বাধিক ব্যবহার হয় রাসায়নিক সুক্রালোজ যেটি চিনির চেয়ে ৬০০ গুণ বেশি মিষ্টি। অ্যাস্পারটেম উচ্চ-তাপমাত্রা সহনশীল নয় বলে বেকারির খাদ্যে এটিকে ব্যবহার করা যায় না। বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াকৃত খাবারে বিকল্প মিষ্টি হিসাবে তাই সুক্রালোজের ব্যবহারই বেশি। চিনির বিকল্প রাসায়নিকগুলোর দৈনিক ব্যবহারের স্বাস্থ্যকর উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া আছে। তবে সেই সীমানার কথা আমেরিকার সরকারি স্বাস্থ্য নিয়ামকের বিবৃতিতেই লিপিবদ্ধ থেকে যায়। বৈজ্ঞানিকরা, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি আর সরকারি নজরদারি সংস্থা সেই সীমানার আলোচনা ও গবেষণা নিয়ে পাঁচতারা হোটেলে মিষ্টি পানীয় পান করতে করতে চর্চা করেন। আমজনতা মিষ্টি পানীয়ের দেড় বোতলের সীমানায় থামতে পারছেন কিনা সেটা তাদের

নজরে পড়ে না। যাই হোক বৈজ্ঞানিকগণ ও সরকারি নজরদারি সংস্থা রাসায়নিক বিকল্প মিষ্টির স্বাস্থ্যকর সীমানা ঠিক করে দিয়েছেন। বিকল্প মিষ্টি ব্যবহারে আমেরিকার খাদ্য ও ওষুধ নিয়ামক সংস্থার (FDA, US Food & Drug Adminitration) নির্দেশিকা :

আমাদের পছন্দ অপছন্দের কথা বাদ দিলেও এটা হয়ত বলা যায় যে, বহুল প্রচারিত ও বিজ্ঞাপিত ডায়েট কোক ও

রাসায়নিক বিকল্প মিষ্টি	ব্যবহারের দৈনিক উর্ধ্বসীমা (মিলিগ্রাম, প্রতি কিলোগ্রাম শরীরের ওজনের জন্য)	চিনির চেয়ে কতগুণ মিষ্টি
অ্যাস্পারটেম	৫০	২০০
সুক্রালোজ	৫	৬০০
নিওটেম	০.৩	৭০০০-১৩০০০
আসিসালফেম-পটাশিয়াম	১৫	২০০
স্যাকারিন	১৫	২০০-৭০০
অ্যাডভান্টেম	৩২.৮	২০০০০

ডায়েট পেপসি আমাদের অনুকম্পার ও স্বীকৃতির অপেক্ষায় শপিং মলের আলমারিতে আবেদনের ভঙ্গিতে বিভিন্ন বিভঙ্গে পোজ দিয়ে খাড়া থাকে। অর্থাৎ তাদের অন্তিম সাফল্যের নির্ণায়কের আপনি ও আমি। ব্যবসার ময়দানে কোক ও পেপসির চিরন্তন সম্পর্ক যেন আদায়-কাঁচকলায়। চিনির বিকল্প মিষ্টি বিপণনে প্রথমে কোকের একটা ভীতি ছিল, ১৯৬৪ সালে ডায়েট পেপসি বাজার যাচাইয়ের কাজটা করে দেওয়ার পরে কোক ঐ একই পথে দৌড় শুরু করল ১৯৮৫ সালে। কোকাকোলা কোম্পানি প্রথমদিকে রাসায়নিক গ্লুকোজবিহীন মিষ্টি অ্যাস্পারটেমের সাথে সস্তার স্যাকারিন মেশানো পানীয় বেচত। এখন যে ডায়েট কোক বাজারে মেলে তাতে অবশ্য সুক্রালোজ আর আসিসালফেম-পটাশিয়াম মেশানো থাকে।

এতটা ধৈর্য ধরে পড়ার পর তার্কিক পাঠক বলবেন, মানে না বললে বুঝব যে আমার আগের যুক্তিগুলো তেমন জোরালো হয় নি যে, চিনি বাদে অন্য শূন্য-শক্তির বা জিরো ক্যালরির চিনির বিকল্প কী দোষ করল? বিজ্ঞানীরা বলছেন, চিনি কেবল ক্যালোরির বোঝাই নয়, আরও কিছু। চিনি বা চিনির বিকল্প আমাদের খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে দৈনিক খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা কি 'মেইন কোর্স' মানে ভাত-রুটি-ডাল-তরকারি-মাছ-মাংস ইত্যাদি সহযোগে পেট ভরে খাবার পরে কেবল তার পরেই মিষ্টির মোহে দই, রসগোল্লা বা আইসক্রিম খাচ্ছি না? ঐ ডেজার্টগুলো খাবার জন্য আমরা ক'জন পেটে খালি জায়গা রাখি? দ্বিতীয়ত উৎস যাই-ই হোক না কেন, মিষ্টি স্বাদের অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে ক্ষুধা-তৃপ্তির অনুভূতি উদ্রেককারী অঞ্চলটির তৃপ্তি মাত্রা (upper threshold of sataity centre) কিছুটা উর্ধ্বে ঠেলে দেয়, ফলে ক্ষুধা-তুষ্টির সীমায় পৌঁছনোর জন্য আমাদের বেশি খেতে হয়। অর্থাৎ মিষ্টির প্রভাবে, তা সে চিনিই হোক আর তার বিকল্প হোক না কেন, অবশেষে বেশ খানিকটা বেশিই খাওয়া হয়ে যায়।[৮]

পরিশিষ্ট

গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (Glycemic index, GI) : শর্করা জাতীয় খাবারের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম অনুযায়ী অন্ত্রের মধ্যে সরল শর্করায় পরিণত হওয়া ও রক্তে শোষিত হবার ক্ষমতা কম বা বেশি হয়। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স তারই এক মাপকাঠি। বিশুদ্ধ গ্লুকোজের রক্তে শোষিত হবার ক্ষমতাকে একক ধরে অন্যান্য শর্করার গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বোঝানো হয়ে থাকে। পূর্ণ দানা (whole grain) বার্লি, ওট, রাই ইত্যাদির মতো অধিক পরিমাণে ফাইবার বা 'হজম না হওয়া' শর্করা সমৃদ্ধ খাদ্যের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। জিলাটিন সমৃদ্ধ 'পাস্তা'ও কম গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সওয়ালা খাবার। কম ফাইবার থাকা সত্ত্বেও, ধীরগতিতে হজম প্রক্রিয়া ঘটার জন্য জটিল রাসায়নিক গঠনের (Highly branched polymer) সিদ্ধ চাল ও ডাল (legums) জাতীয় খাবারেরও গ্লাইসেনিক ইনডেক্স কম। চিনি, সাদা আটা, ময়দা, চকচকে সাদা পালিশ করা সরু চাল ইত্যাদির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ১০০ শতাংশের কাছাকাছি হলেও পাস্তা ও আপেলের ক্ষেত্রে সেটা যথাক্রমে ৭০ ও ৫৫ শতাংশ। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খাবার অব্যবহিত পরে রক্তে শর্করার মাত্রা নির্ধারণ করে, কিন্তু মোট শর্করা শোষিত হবার পরিমাণ নির্ধারণ করে না। সেটা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন হয় 'গ্লাইসেমিক লোড' নামে আরেকটি মাপকের।

গ্লাইসেমিক লোড (Glycemic load, GL) : শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণ করা পরে, রক্তে মোট শর্করা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে খাবারে হজমযোগ্য শর্করার পরিমাণ ও তার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের ওপর। খাদ্যের শর্করা জাতীয় খাবারের আনুপাতিক পরিমাণের সঙ্গে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স

গুণ করে গ্লাইসেমিক লোড নির্ণয় করা হয়। আলু, সাদা সরু ও চকচকে পালিশ করা চাল, সাদা আটা, ময়দা ইত্যাদিও খাদ্যে হজমের অযোগ্য তন্তু কম থাকায় এই সব খাবারের গ্লাইসেমিক লোড বেশি। পূর্ণ-দানার চাল, গম ইত্যাদি সিরিয়াল, সবজি বা অঙ্কুরিত ছোলায় বেশি ফাইবার থাকার ফলে এই সব খাবারের কম গ্লাইসেমিক লোড হয়। দৈনিক খাদ্যতালিকায় এই শেষোক্ত ধরনের খাবারের অন্তর্ভুক্তিতে শর্করা জাতীয় খাবারে রাশ টানা যায়, ফলে স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক রোগভোগের বোঝা অনেকাংশে কমানো যায়। সাদা দানাদার চিনি যেমন একদিকে হজমের অযোগ্য তন্তুবিহীন অন্যদিকে এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ১০০ শতাংশের কাছাকাছি। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, উচ্চ গ্লাইসেমিক লোড যুক্ত চিনি সেই কারণে বর্জনীয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. Gross LS, Li L, Ford ES, Liu S. Increased consumption of refined carbohydrates and the epidemic of type 2 diabetes in the United States: an ecologic assessment. Am J Clin Nutr 2004; 79:774.

২. U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans 2010. 7th Edition , Washington, DC: U. S . Government Printing Office , December 2010. http : //www.dietaryguidelines.gov.

৩. Mozaffarian D, Hao T, Rimm EB, et al. Changes in diet and lifestyle and long-term weight gain in women and men. NEngl J Med 2011; 364:2392.

৪. Cohen L, Curhan G, Forman J. Association of sweetened beverage intake with incident hypertension. J Gen Intern Med 2012; 27:1127.)

৫. Raben A, Vasilaras TH, Møller AC, Astrup A. Sucrose compared with artificial sweeteners: different effects on ad libitum food intake and body weight after 10 wk of supplementation in overweight subjects. Am J Clin Nutr 2002; 76:721

৬. http://circ.ahajournals.org/content/106/4/523.full

৭. http://www.medpagetoday.com/Cardiology/MyocardialInfarction/31614

৮. Raben A, Vasilaras TH, Møller AC, Astrup A. Sucrose compared with artificial sweeteners: different effects on ad libitum food intake and body weight after 10 wk of supplementation in overweight subjects. Am J Clin Nutr 2002; 76:721

উমা

আসমা জাহাঙ্গীর: আকাশের অধিকার

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

গত ১১ ফেব্রুয়ারি লাহোরে প্রয়াত হলেন আসমা জাহাঙ্গীর। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি তাঁর জন্ম ওই লাহোরেই। ৬৫ বছর বয়সটা চলে যাওয়ার বয়স নয়। আসমার জন্য অবশ্য নব্বই বছরটাও মৃত্যুর পক্ষে ঠিক নয় বলে মনে হয়। অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল। সারা পৃথিবীর এই দুর্দিনে স্পষ্টভাবে সত্যি কথা মেরুদণ্ড সোজা রেখে বলতে পারার মানুষ যখন ক্রমশই কমে আসছে, তখন আসমাদের মতো মানুষ চলে গেলে পৃথিবীটা আর একটু কম বাসযোগ্য হয়ে যায়।

আসমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল প্রথম যেবার 'পাকিস্তান ইন্ডিয়া পিপলস্ ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসির' যৌথ সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে পেশোয়ার গিয়েছিলাম, তখন। সেটা ১৯৯৮ সাল। আসমা তখন ছিপ্‌ছিপে খুব সাধারণ দর্শন, টানটান করে চুল বাঁধা প্রসাধনবিহীন মুখের একটি মেয়ে। এমনিতে তাকে ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্য করার কিছু নেই। কেবল সে যখন কথা বলে, তার উজ্জ্বল অপ্রতিম চোখের দৃষ্টি আর স্পষ্ট কথায় খুব সহজেই বোঝা যায়, সে 'আসমা'— যে শব্দের অর্থ 'আকাশ'। অন্য কেউ নয়। পাকিস্তানে যাবার আগেই তার নাম আমি শুনেছিলাম। তার পরিচয়ও খানিকটা জানাই ছিল। কিন্তু আলাপ হল মঞ্চের ওপর। ভারত থেকে যতদূর মনে পড়ছে, আমরা আবুল কালাম আজাদের রচনাসংগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলাম পি আই পি এফ পি ডি-এর পাকিস্তান শাখাকে উপহার দেবার জন্য। আমার ওপর ভার পড়েছিল মঞ্চে আসমার হাতে উপহারটি তুলে দেবার। শাড়ি পরা আমাকে আসমার প্রথম সম্ভাষণ 'শাড়ি কিন্তু ভারি সুন্দর একটা পোশাক'। এই দিয়ে গল্পের শুরু। ঠিক দুটি প্রতিবেশী মেয়ে যেভাবে শুরু করে। এরপর অনেক কথা হয়েছিল। পাকিস্তানের মেয়েরা, সামরিক শাসনে শাড়ি পরা নিষিদ্ধ হওয়া, আমাদের দেশের মেয়েরা অনার কিলিং, পণপ্রথা, স্বাধীনতা আন্দোলন, জিন্না, নেহরু— আসমার সঙ্গে কথা

বলতে বলতে একবারও কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য হয় না। এটাই আসমার সবচেয়ে বড় গুণ। কথাটা আমার পরে মনে হয়েছে। কোনো মেয়ে কখনও তাকে নিজের বোন বা দিদি মনে করতে গিয়ে হোঁচট খাবে না একবারও। অকপটে সব কথা বলা যায় তাকে।

প্রদীপ জ্বালার আগে, সলতে পাকানোর কাজটি অবশ্য শুরু হয়েছে আসমার শৈশবেই। আসমার বাবা, মালিক গুলাম জিলানি ছিলেন আওয়ামি লিগের নেতা। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়ে বিধায়কপদ থেকে ইস্তফা দেন। তৈরি করেন সংগঠন– 'ফ্রেন্ডস্ অভ বাংলাদেশ'।

বরাবর তিনি স্বাধীন গণতান্ত্রিক আবহে সাম্যের কথা ভেবেছেন। শুধু ভেবেছেন বললে ভুল হবে, তিনি প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। পরিণামে জেল খেটেছেন। আসমা ঠাট্টা করে বলত, 'জেলখানা খারাপ জায়গা কেন বলে লোকে? আমি তো জানি, জেলখানা বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবার জায়গা!'

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাবার মতোই মেয়েও গর্জে উঠেছে বারবার। আর সেই গর্জনের দায় হিসেবে জেলেও যেতে হয়েছে।

মালিক গুলাম জিলানি যে নীতিগতভাবে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ ছিলেন, এমনটা নয়। তিনি নিজের পরিবারেও একটা সাম্যের আবহাওয়া তৈরি করতে পেরেছিলেন। আসমার মায়ের নিজের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। বাল্যকালের কথায় আসমা বলতেন, 'আমাদের ছিল হট্টগোলের বাড়ি। রাজনৈতিক দলের লোকেদের যেমন হয়। কে আসছে, কে খাচ্ছে, কে কখন বেরিয়ে যাচ্ছে, কিছু ঠিক নেই। খিদে পেলে, আমরা খেতাম। কোনও নির্দিষ্ট সময়েই যে লাঞ্চ বা ডিনার করতে হবে, এমনটা নয়। আমি কিন্তু কোনোদিন কোনো বাধা পরিবারের পক্ষ থেকে পাই নি।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তাই কি তুমি কোনো মেয়ের পায়ে বেড়ি দেখতে পারো না?' আসমা বলে, 'কী বলব আর! একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে কাকে বিয়ে করবে, ঠিক করবে বাড়ির কোনো পুরুষ সদস্য। মানা যায়?'

আসমা তার পেশাগত জীবনে ছিল আইনজীবী। হাইকোর্ট এবং পরে সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিশ করত। কিন্তু এই পেশা ছিল তার মানবাধিকারের হাতিয়ার। কোথায়, কোন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তাকে ন্যায় দেবার লড়াই-ই ছিল জীবনের মূল লক্ষ্য।

নারী স্বাধীনতা কথাটি এখন বহু ব্যবহারে এবং ভুল ব্যবহারে একেবারে লঘু হয়ে পড়েছে। কিন্তু আসমা যাদের জন্য লড়াই করত, তারা প্রকৃতই পুরুষতন্ত্রের চাপে, ধর্মীয় অনুশাসনের চাপে, সমাজের বিধানের চাপে একেবারে কোণঠাসা। আসমা তাদের জীবনে ফিরিয়ে আনার ব্রত নিয়েছিল। খুব কঠিন সেই ব্রত। প্রায় প্রত্যেকদিন একবার না একবার হুমকি পেত চিঠিতে বা ফোনে। আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে বারবার। কিন্তু তাকে দমানো যায় নি। বহুবার তার কাছে অত্যাচারের কথা বলে ন্যায় চাইতে এসেছে মেয়েরা, থেকে গেছে তার বাড়িতে। আসমার বাড়ির দরজা অবারিত।

ভারত-পাকিস্তানের সুসম্পর্ক ছাড়া যে দুটি দেশেরই ক্ষতি— একথা আসমা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত। আর তাই 'ভারতের দালাল' তকমাটি রাজনীতির কারবারিরা তার গায়ে আটকে দিতে দেরি করে নি। কিন্তু যে কথা সে মনে করে, সে কথা বলতে তার কোনো দ্বিধা ছিল না।

কিছুদিন ছাড়া-ছাড়াই তাকে রাষ্ট্র হয় জেল বন্দী, নয় গৃহ বন্দী করে রাখত। আর রাষ্ট্রের এই আচরণ তার কাজকে জনমানসে উজ্জ্বলতর করে তুলত। দিন দিন মেয়েরা তাকে বেশি ভরসা করছিল। নিজেদের অবস্থানকে প্রশ্ন করতে শিখছিল। আর তার মৃত্যুর পর, তাই হাজার হাজার মেয়ে সামিল হয়েছিল শেষকৃত্যে। অদৃষ্টপূর্ব এই ঘটনা কেবল পাকিস্তানকে নয়, সারা পৃথিবীকেই আশ্চর্য করেছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে আসমা তার কাজের স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছিল এটা ঠিক। কিন্তু কখনই পায়ের তলার মাটি সরে যায় নি। নিজের দেশের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল। পাকিস্তানের 'মানবাধিকার কমিশন' তার হাতেই প্রথম তৈরি হয়। পাকিস্তানের আইনজীবীদের অধিকার আন্দোলনও গতি পায় তারই হাতে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের 'রাপোর্টিয়ার অন ফ্রিডম অভ রিলিজিয়ান অ্যান্ড বিলিফ' ছিলেন। 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ'-এরও ট্রাস্টিও ছিলেন। ম্যাগসাইসাই সহ 'হিলাল-এ-ইমতিয়াজ' ইত্যাদি নানা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে।

কিন্তু এ সব কিছুই তার মূল কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পদক্ষেপ মাত্র। আদতে সে ছিল বিশ্বমঞ্চে তৃতীয় বিশ্বের উৎপীড়িত মেয়েদের কণ্ঠস্বর।

আসমার ছোট বোন হিনা জিলানিও দিদির পথের পথিক ব্যক্তিগত জীবনে। দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে নিয়ে খুবই সুখী পরিবার ছিল। নিজেই ভালবেসে বিয়ে করেছে। আজীবন সেই জীবনসঙ্গী ছিল তার সহযাত্রী। ঠাট্টা করে আসমা বলত

তাকে কেউ একমাত্র ছেলের বউ হিসেবে নির্বাচন করবে এটা ভাবনার অতীত।

এই লেখাটি লিখতে লিখতে বারবার সেই হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটি আর কণ্ঠের ঠাট্টা মাখা সুরটি মনে পড়ে। ঐ একবারই আসমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প হয়েছিল, যা আরও একবার পাকিস্তান গেলেও হয় নি। আসমাও এসেছে ভারতে। কিন্তু তার কাজের কথা, পাকিস্তানের শ্রেণী-নির্বিশেষ মেয়েদের হয়ে লড়াইয়ের এক-একটি ঘটনার খোঁজ রেখেছি। শুনে ভারি গর্ব হত। কেন যে ওকে একদম পড়শি চেনা মেয়েটির মতো নিজের মনে হত!

১২ তারিখ কাগজে তাই খবরটা ব্যক্তিগত ক্ষতির মতো বিদ্ধ করল। ভাবতে পারছি না, সেই দূর-দূরান্তের মেয়েদের কথা, যারা ভাবত, নিজের সমস্যা নিয়ে একবার শুধু আসমার কাছে পৌঁছনোর অপেক্ষা। দায়িত্ব তারপর আসমার। তাদের কী হবে?

কোনো শূন্যস্থানই যেমন শূন্য থাকে না, তেমন এটাও তো ঠিক যে, কোনো কোনো শূন্যতা আর আগের মতো পূর্ণ হয়ে ওঠে না।

উমা

চিকিৎসক নিগ্রহ ও সুস্বাস্থ্যের অচ্ছে দিন

জয়ন্ত দাস

এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। এটা প্রমাণের জন্য বেশি কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজন নেই, যে কোনো হাসপাতালের আউটডোরে ঢুঁ মারলেই হবে। কাতারে কাতারে রোগীকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে চলেন দু-চারজন করে ডাক্তার। তাঁরা সকালে এসে বসেন, বাথরুমে যাওয়ারও ফুরসত পান না! নামী বেসরকারি হাসপাতালের চাকচিক্য মোহিত করতে পারে, কিন্তু এটাও জেনে রাখা দরকার, সেরা ডাক্তাররা থাকেন সরকারি হাসপাতালেই। দিনে অসংখ্য রোগী দেখার কারণে ওঁদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। সর্বোপরি ওঁরা শুধু রোগীর স্বার্থটাই দেখেন। বেসরকারি হাসপাতালের বিখ্যাত চিকিৎসক আগে দেখেন তাঁর সংস্থার ব্যবসায়িক স্বার্থ। বিজ্ঞাপনী বাধ্যবাধকতায় সংবাদপত্রে বেসরকারি হাসপাতাল নিয়ে কিছু লেখা হয় না। ফলে সাংবাদিকদের যত নজর গিয়ে পড়ে সরকারি হাসপাতালে। এটা নেই, ওটা নেই, এই গাফিলতি, ওই ত্রুটি ইত্যাদির নিত্য খবরে প্রশাসন কতটা সক্রিয় হয় তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে নিশ্চিত বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। কেউ কেউ এসবের পিছনে কর্পোরেট হাসপাতালগুলির চক্রান্তের কথাও বলে থাকেন। নিরন্তর ছুটে চলা, অবসরহীন এই সময়ের মানুষের ধৈর্য কমতে কমতে তলানিতে। অল্পেই ঘটছে বিস্ফোরণ। স্থানীয় রাজনৈতিক দাদাদের মদতপুষ্ট হলে তো কথাই নেই। এরা পুলিসকেই ছেড়ে কথা বলে না তো ডাক্তার! অশিক্ষিত এই লোকজন চিকিৎসা বলতে বোঝে রোগীর মাথার কাছে ডাক্তারের দাঁড়িয়ে থাকা। একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে চলে গেলে সেটা বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা বলেই তারা ধার্য করে। সরকারি হাসপাতালে ফাঁকিবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত, বিবেকহীন ডাক্তার নার্স নেই তা নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে যা পরিস্থিতি তাতে সংখ্যাগুরু পরিশ্রমী, আন্তরিক, মানবিক ডাক্তার, নার্সরাই বিপদে। তাতে আখেরে ক্ষতি সাধারণ মানুষেরই, এটা তারা যত তাড়াতাড়ি বোঝে তত মঙ্গল।— সঃ

ফেসবুকে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছিল কিছুদিন আগে। পোস্টটা পেলাম হোয়াটসঅ্যাপ-এ, ৮ মার্চ; হ্যাঁ, আন্তর্জাতিক নারীদিবসেই। পোস্টটা ছিল এরকম—

'আমি ডাক্তার কৃষ্ণা বর্মণ। হাসপাতালে রোগী দেখছিলাম। মথুরাপুর ব্লক হসপিটাল। একটি মরণাপন্ন শিশুকে আনা হয়েছিল গতকাল রাতে। আনা মাত্রই শিশুটিকে স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়। শিশুটির অবস্থা খারাপ। তাকে উন্নততর পরিষেবা দেওয়ার জন্য ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে রেফার করা হয়। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বুঝিয়ে দেন শিশুটির পরিবারকে।

তাঁরা নিয়ে যেতে রাজি হন নি। গাফিলতি করেছেন। পরদিন সকালে দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিশুটি মারা যায়। প্রতিটি মৃত্যু চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে কষ্টকর। আমরা মৃত্যু ঠেকাতে ডিউটিতে আসি। প্রাণ নিতে নয়।

দুর্ঘটনার কিছু পরপরই কিছু স্থানীয় লোক (যাদেরকে বরাবর খেপানো হয়) হাসপাতালে ঢুকে আমাকে চড়, থাপ্পড় মারতে শুরু করে। আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। এতদিন ধরে রোগীদের সার্ভিস দেওয়ার এই প্রতিদান?

ওরা আমার মাথা ঠেসে ধরে, গলা টিপে ধরে। অশ্লীল কথা বলে। শরীরের বিভিন্ন অংশে মারে। প্রাণে মারার হুমকি দেয়। আমি গলার ফাঁস ছাড়াতে গেলে আমার মাথা ঠুকে দেয়। কান মুচড়ে দেয়। প্রাণভয়ে আমি কোনওভাবে পালিয়ে যাই। উন্মত্ত দুষ্কৃতীরা আমার পিছনে তাড়া করে। পুলিশ এসে যাওয়ায় কোনওভাবে পাশের ওয়ার্ডে ঢুকে প্রাণ বাঁচাই।

আমি ডাক্তার কৃষ্ণা বর্মণ— ১) আমার ওপর এই বর্বরতার প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ কই? কোনও প্রতিবাদ নেই কেন? ২) নারীবাদীরা চুপ কেন? একজন মেয়েকে চূড়ান্ত আক্রমণ করা হল, ছিছিক্কার কোথায়? ৩) বুদ্ধিজীবীর দল চুপ কেন? কবিতা লেখা হচ্ছে না কেন? পুরস্কার জুটবে না তাই? ৪) লেনিনের মূর্তি ভাঙা নিয়ে যাঁরা শঙ্কিত তাঁরা আমার মানবাধিকার নিয়ে কি ততোটাই শঙ্কিত? ৫) কর্তব্যরত অবস্থায় সরকারি কর্মীকে মারধর কি ভয়ঙ্কর অপরাধ নয়? ৬) আমাকে এইভাবে মারধর অপমানের পরও কেন দোষীরা ধরা পড়ছে না? ৭) আমি এবং অন্যান্য ডাক্তাররা চাইছি না এদেশে পরিষেবা দিতে। রোজ এভাবেই কেউ না কেউ মার খাচ্ছে। দয়া করে ডাক্তারদের ভুলত্রুটি আলাচনা করবেন না এখানে। গলদ সিস্টেমেও। ভুল সবার হয়। অন্যান্য পেশার মানুষরা কি মার খান, অপমান হজম করেন? নাকি মার খাওয়া অভিপ্রেত? কোন সভ্য সমাজে এমন হয়। ৮) আপনার ছেলেমেয়েদের ডাক্তারি পড়াবেন? স্বাস্থ্য পরিষেবাতে পাঠাবেন তো মার খেতে? ৯) আমি কারও দিকে আঙুল তুলছি না। শুধু সুবিচার চাই। নিরাপত্তা চাই। ভুল কিছু চাইছি? ১০) দয়া করে আমাকে 'সরকার বিরোধী' ছাপ মারবেন না। আমি রাজনীতি করার জন্য প্রশ্ন করি নি। আমি তৃণমূল হই কি বিজেপি, কংগ্রেস কি সিপিএম সেটা আমার পরিচয় নয়। দিনের শেষে আমিও একজন ছাপোষা মানুষ, একজন নারী, একজন কর্তব্যপরায়ণ চিকিৎসক। আমার ভুলভ্রান্তি দেখার জন্য আমার প্রশাসন আছেন।

দুষ্কৃতীরা কেন আমার উপর হামলা করার সাহস পাবে? ফেসবুকে যারা রোজ গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিবাদ করেন তাঁরা বলুন এই সমাজ কোন দিকে চলেছে? অন্ধকার থেকে কোনদিকে? লাইক দেবেন না। বলুন। যাঁরা পড়ে চুপিচুপি চলে যাচ্ছেন, ভাবুন। আপনার কেউ না কেউ আত্মীয় ডাক্তার এমন মার খেতেই পারেন। সেটা আপনি গ্যারান্টি দিয়ে 'না' বলতে পারবেন না। তাহলে উপায় কী? এভাবেই চলুক... বাঃ বাঃ বাঃ"

— ওপরের পোস্টটি ডাঃ কৃষ্ণা বর্মণের জবানিতে লেখা হলেও পরে জেনেছি ওটা তাঁর করা পোস্ট নয়। তবে খবরের কাগজ দেখে বুঝেছি, কৃষ্ণার জবানিতে অজ্ঞাত লেখক ভুল বলেন নি। 'এই সময়' সংবাদপত্র লিখেছে, 'দেওয়ালে ঠেসে ধরে থাপ্পড় মহিলা চিকিৎসককে 'সবক'।'

ডাক্তারদের গ্রুপে একজন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবল আত্মধিক্কারে লিখলেন, 'ব্যাপারটা খুবই সামান্য। মথুরাপুর গ্রামীন হাসপাতালে (সেটা কোথায় কে জানে) ডাঃ কৃষ্ণা বর্মণ নামে একজন মহিলা চিকিৎসক সামান্য নিগৃহীতা হয়েছেন। তাঁর গলা ধরে দেয়ালে চেপে ধরে টুকটাক চড় থাপ্পড় মারা হয়। তারপর কান ধরে, হাত মুচড়ে সামান্য টুকটাক আঘাত করা হয়। এতেই ডাঃ বর্মণের কান কেটে যায়। আর চশমাটাও মাটিতে ফেলে সামান্য দুমড়ে মুচড়ে দেওয়া হয়েছে, সাথে টুকটাক কিছু পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ...

এই সামান্য ঘটনার জন্য সমাজের কিই বা এসে যায়? অথবা সুশীল সমাজের! আর যা দিনকাল... এত গরম, ছেলেমেয়ের পরীক্ষা, তার ওপর মোমবাতির এত দাম বেড়ে গেছে, তাই মানবাধিকার সমিতি, মহিলা কমিশন বা বিদ্বজ্জন সমাজ কেউ কোন মিছিল বের করার কথা ভাবেন নি। অথবা কোন বিবৃতিও দেন নি।'... (ডাঃ কৌশিক লাহিড়ী)

আর কেন এ পেশায়, অভিশপ্ত আত্মধিক্কারে?

অ্যানাটমির প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক প্রয়াত ডাক্তার সমর মিত্র, বলতেন, ডাক্তারিতে 'ঢুকতে কষ্ট, ঢুকে কষ্ট, বেরতে কষ্ট, বেরিয়ে কষ্ট'। সেটা জেনেও বহু মেধাবী ছেলেমেয়ে এই পেশায় আসে, আসত। অনেকে আইআইটি, যাদবপুর, শিবপুর, প্রেসিডেন্সি ছেড়েও মেডিকেল কলেজে ঢোকে, এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি। চারদিকে যা ঘটছে তা দেখে তিন-চার দশক ডাক্তারি করা অনেকেই মনে হচ্ছে, ডাক্তারি পড়াটা জীবনের ভুল হয়ে গেল নাকি?

কৃষ্ণা বর্মণ একা শিকার হলে এমনটা মনে হত না। দোষের বিচার হলে, আইনি ব্যবস্থায় সাজা পেলেও এমন মনে হত না। মানুষের জীবন নিয়ে চিকিৎসকদের কারবার, তার ওপর প্রচণ্ড চাপ সর্বদা। ভুল হয় নানা কারণে। তবু ভুল হলে মরমে মরে যান তাঁরা। প্রতিদিন নতুন জানার চেষ্টা করতে হয়। কিছু পারা যায়, কিছু যায় না। সব ঠিক হয় তা নয়, কিন্তু নেহাত

অবহেলায় বা অমার্জনীয় অজ্ঞতায় করা কোনো ভুলের ক্ষমা নেই।

যা চলছে, তা তো গুণ্ডামো! অথচ সমাজের মাথাদের কোনো হেলদোল নেই। ভাবখানা এমনই ডাক্তার হয়েছে, গাড়িবাড়ি করেছে, এখন ম্যাও সামলাও! কেউ কি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন, হামলাকারীরা সদ্-বিচার করতে পারে? যাঁরা মার খাচ্ছেন তাঁরা ভুল, আর হামলাকারীরা ঠিক? একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, শোকার্ত আত্মীয়-পরিজনদের হয়ে মারধর-ভাঙচুরের গুরুদায়িত্ব হাতে তুলে নিচ্ছে কিছু অন্যরকম লোক, বেশ পেশাদারি দক্ষতায়। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বেসরকারি হাসপাতালের কর্মকর্তাদের খুব ধমকালেন, টিভিতে তা সরাসরি সম্প্রচার হল। বেসরকারি হাসপাতালের ত্রুটি তাতে কমল এমন খবর নেই। কিন্তু ডাক্তারদের ওপর আক্রমণ ঘটেই চলেছে।

এই এক বছরে ৮৬টি ডাক্তার নিগ্রহের কাহিনী প্রকাশ্যে এসেছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, তার অন্তত দশগুণ নিগ্রহ ঘটেছে, কেন না প্রায় কোনো ডাক্তারই চান না তাঁর হেনস্থার ঘটনাটি পাঁচজনের রসালো আলোচনার বিষয় হোক। উপায়ান্তর না দেখে অনেক নার্সিংহোম ও বেসরকারি হাসপাতাল ঝামেলা এড়াতে স্থানীয় দাদাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করছে। ভেবে দেখুন, কার টাকা কার ঘরে ঢুকছে?

কদিন আগে, ২০১৮-র ৫ মার্চ। বোলপুরে এক মহিলা ডাক্তার সিজারিয়ান অপারেশন করার পরদিন ভোরবেলা রোগিণী মারা যান। রটিয়ে দেওয়া হল, ঐ মহিলা ডাক্তারকে বারবার ফোন করা হলেও আসেন নি। মিডিয়া ডেকে, ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপে প্রচারিত হলঞ্চ ডাক্তারের অবহেলায় মারা গেছে রোগী। সব মৃত্যু দুঃখজনক। বিশেষ করে যখন এক নতুন মা মারা যায়, তখন তা আরও দুঃখের। কিন্তু একটু ভাবুন, ডাক্তার যদি এতই দায়িত্ববোধহীন যে রাতে বারবার ফোন করাতেও এলেন না, তবে হঠাৎ ভোরে রোগী মারা গেলে তিনি মার খেতে পারেন জেনেও এলেন কেন? ডাক্তার বলেছেন, তাঁকে নার্সিংহোম থেকে ফোন করার দশ মিনিটের মধ্যেই চলে আসেন ও দেখেন রোগী মারা গেছে। তার আগে তাঁকে ফোন করা হয় নি। তিনি আগে ফোন পেয়েছিলেন কিনা সেটা ধরা আজকের দিনে কোনো ব্যাপারই নয়। তা না দেখেই ডাক্তারদের ওপর আক্রমণ! পুলিশ এসে ডাক্তারকে নিয়ে বসিয়ে রাখল থানায়। হামলাকারীরা বোকা নয়, তারা জানে কী করলে কার লাভ। তারা এমনি এমনি ঐ বিশেষ ডাক্তারকে গুলি করে মারার, বোলপুর থেকে তাড়ানোর হুমকি দিচ্ছে, এমন ভাবলে ভুল হবে।

এভাবে সমস্ত ডাক্তারকে পদানত করার চেষ্টা চলছে। আর সাধারণ মানুষ, যাঁরা ডাক্তারকে এককালে ভগবান ভাবতেন, তাঁরা কয়েকজন ডাক্তারের অসততা ও নিষ্ঠার অভাব দেখে সব ডাক্তারকে নির্বিচারে এক গোত্রে ফেলে দিচ্ছেন। একদিকে ডাক্তারি পেশায় মেধাবী ছাত্র ঢুকছে না, অন্যদিকে বেসরকারি হাতে চলে যাচ্ছে ডাক্তারি শিক্ষা, কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে 'তৈরি' হচ্ছে এমন ডাক্তার, যাদের ডাক্তারি শুরু করেই ভাবতে হচ্ছে কত দ্রুত ঐ পড়ার খরচ তোলা যায়। ডাক্তার মেরে 'সবক' শেখানো জনগণ এখনও বুঝতে পারছেন না, যে রকম ডাক্তার দেখে তাদের আক্রোশ তার থেকে শতগুণে খারাপ ডাক্তার তৈরি হবার পথ তৈরি হচ্ছে তাঁদেরই চিন্তাহীন হিংস্রতার উপজাত হিসেবে।

ডাক্তারি পড়তে অনীহ হচ্ছে মেধাবীরা, অন্যদিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ডাক্তারি শিক্ষাব্যবস্থা। আর যাঁরা ডাক্তার হয়ে গেছেন, তাঁরা অবস্থা দেখে আর সরকারি চাকরি নিতে চাইছেন না। গত আশি ও নব্বইয়ের দশকে 'ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চায় না' বলে রব তুলেছিল তৎকালীন শাসকদল। জুনিয়ার ডাক্তাররা হাজারে হাজারে পথে নেমে জানিয়ে দিয়েছিল, গ্রামে যেতে তারা রাজি, সরকারই ডাক্তারদের গ্রামে পাঠাচ্ছে না। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। গ্রামে গিয়ে কাজ করতে তখনও নানা অসুবিধা হত, সরকার ডাক্তারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মুক্তি পেতে চাইত, কিন্তু আজকের মতো সমস্ত স্তরের মানুষকে খেপিয়ে ডাক্তারের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হত না।

গত দুর্গাপূজার আগে মেদিনীপুরের ডেবরায় ডাক্তারের ওপর শুধু আক্রমণ হল তাই নয়, তাঁর গায়ে বিষ্ঠা মাখানো হল। সরকার দর্শক। ডাক্তারের কী দোষ ছিল জানাই গেল না! একই ডাক্তারকে দিয়ে একটি সদ্য-চালু-হওয়া সুপার-স্পেশালিটি ও একটি গ্রামীণ হাসপাতালের প্রশাসন চালাতে হলে দশভুজাও ইস্তফা দিতেন। এখন ডাক্তারকে ছাড়া হচ্ছে না। নতুন ডাক্তার কাজে যোগ দিচ্ছেন না, তাই অবসরের বয়স পিছিয়ে বাষট্টি, তারপর পঁয়ষট্টি করা হচ্ছে। এমডি এমএস পড়তে গেলে বন্ড সই করিয়ে গ্রামে কাজ করানো হচ্ছে। একই সঙ্গে গ্রামের-শহরের মানুষ যাতে ডাক্তারকেই সকল নষ্টের গোড়া বলে ভাবেন, যাতে ডাক্তারের ওপর চড়াও হয়ে কিল-চড়-ঘুঁষি চালিয়ে তৃপ্তির শ্বাস ফেলতে পারেন 'কেমন দিলাম' সন্তুষ্টিতে তার ব্যবস্থা পাকা।

প্রয়াত চিকিৎসক শৈবালকিশোর রায়

'রাজ্যে ডাক্তারের আত্মহত্যা, সরকারি হাসপাতালে জোর করে কাজ করানোর অভিযোগ' শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয় 'এবেলা'য়, গত ১৫ মার্চ। তাতে লেখা হয়েছে, আত্মহত্যা করলেন উলুবেড়িয়ার বর্ষীয়ান চিকিৎসক শৈবালকিশোর রায়। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, মানসিক অবসাদ ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাজের চাপ সামলাতে না পারাতেই শৌচাগারে গিয়ে অ্যাসিড খান শৈবালবাবু। তাড়াতাড়ি তাঁকে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায় নি। কেন একজন বর্ষীয়ান চিকিৎসককে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হল? পরিবারের দাবি, অবসরের পরেও তাঁকে রাখা হয়েছিল। কখনও শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কখনও পাস্তুর ইনস্টিটিউশনে ডিউটি করতে হচ্ছিল। শারীরিকভাবে অসুস্থ শৈবালবাবু চাকরি থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। কিন্তু বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ সাড়া দেয় নি। চোখ ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এজন্য চিকিৎসাও চলছিল। ক্রমে আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছিলেন। সোমবার কর্মস্থলে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের দাবি, শৈবালবাবুর মধ্যে সবসময় একটা ভয় কাজ করছিল। এই অবস্থায় কোনও ভুল চিকিৎসা করে ফেলতে পারেন বলে তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল। শুক্রবারই চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। তার আগের দিনই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা।

এই মৃত্যু নিয়ে শ্বেতা চক্রবর্তী 'একটি আত্মহত্যা— অতঃ কিম্?'-এ লিখেছেনঃ

'শৈবালকিশোররা একদিন মন দিয়ে রোগী দেখতো।/ শৈবালকিশোররা একদিন ভালোবেসে রোগী দেখতো।/ শৈবালকিশোররা একদিন ফাগুনের অচঞ্চল শিমূল হয়ে রোগী দেখতো।/ একদিন, হায়, একদিন পলাশ হয়ে রোগী দেখতো।/ শৈবালকিশোররা কারো কোনো ক্ষতি করে নি।/ শৈবালকিশোর হাসতে হাসতে রোগী দেখতে চেয়েছিল।/ চেয়েছিল কেবল সহজ আলোর মত রোগী দেখতে।/ চেয়েছিল মাথা নিচু করে নিষ্ঠাভরে ওষুধ লিখতে।/ চেয়েছিল আনন্দযজ্ঞে তাঁর নিমন্ত্রণ।/ নিজের বাড়ির থেকে দু'পা গিয়ে যতটুকু নিঃশ্বাসের মতন সহজ, সুন্দর, ততটুকু, হায় ততটুকু রোগী দেখতে।/... শৈবালকিশোর বাঁচতে চেয়েছিল অশোকে পলাশে।/ কে তাঁকে বাঁচতে দিল না?/ এই দায় কার?/ হে সমাজ, হে রাষ্ট্র, হে পাপী মারমুখী জনতা,/ এবার তো সচেতন হও।/ এবার তো আর দশজন শৈবালকিশোরকে বাঁচতে দাও।'

ডাঃ কৃষ্ণা বর্মণের ঘটনাটি নিয়ে এক অ-ডাক্তার বন্ধু বললেন, তাঁর ধারণা এই বর্বরতা চট করে থামবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে কমবে, বাড়তেও পারে। কোনও সংগঠিত প্রতিবাদ নেই তো! কর্পোরেট হাসপাতালের ডাকাতিতে তিতিবিরক্ত মানুষের ক্ষোভটা সুচতুরভাবে পুরো ডাক্তারদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আসল রাঘববোয়ালদের আড়াল করে দিয়েছে। এরসঙ্গে এক শ্রেণীর ডাক্তারের কুকর্মও জুড়েছে। মানুষ বুঝছে না, কৃষ্ণারা যে সার্ভিস দিচ্ছেন, তা অমূল্য। সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সবচেয়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা অবস্থা ওঁদেরই। মহিলা বলেও ছাড় নেই! এই অবস্থায় আদর্শ ধরে রাখা বড্ড কঠিন। গড়পড়তা মানুষ চালাকিটা বুঝবে না। তাই পরিস্থিতি ভীষণ কঠিন বলে মনে হয়।

খাঁটি কথা। একবার দেখে নিই শেষতম সরকারি চালাকিটা। স্বাস্থ্য বাজেট ২০১৮। নীরব মোদী, তাঁর প্রণম্য পূর্বসূরী ললিত মোদী ও বিজয় মাল্যর পদানুসরণ করে সরকারি ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দিব্যি আছেন। স্বাস্থ্য বাজেট নিয়ে কথা বলতে ব্যাঙ্কের টাকা মারার কথা আসে কেন? আসে। কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন ২০১০ সালে শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বে উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠন করেছিল, উদ্দেশ্য সবার চিকিৎসার সুযোগ গৌঁছে দেওয়া। সেই বিশেষজ্ঞ দল রিপোর্ট দিয়েছিল, ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের জিডিপি-র শতকরা ২.৫ ভাগ সরকার খরচ করলেই সমস্ত দেশবাসীর নিখরচায় সমস্ত ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্ভব, আর রোগ আটকানোর কাজও করা যায়। জিডিপি-র শতকরা ২.৫ ভাগ মানে, নীরব মোদী একা যে টাকাটা মেরে দিয়েছে, তার ২০ গুণ টাকা। এটা সবার জেনে রাখা দরকার, **জাতীয় সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট যত টাকা মার গেছে সব বড় মালিকদের হাতে, তার মাত্র সিকিভাগ জাতীয় স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করতে পারলেই মানুষের পকেট থেকে একপয়সা খরচ না করে টিকাকরণ, হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধ, ইনডোর, আউটডোর, এমন কি আইসিইউ— এসবই হয়ে যেত।**

এদিক থেকে নজর ঘোরানোর জন্য দুটো কাজ সরকারগুলো খুব দক্ষতার সঙ্গে করছে। এক, নানা ছোটবড় মাপের জনমোহিনী প্রকল্প এনে, নিখরচায় স্বাস্থ্যবিমা করে দিয়ে মানুষকে তুষ্ট রাখছে আর বিমার টাকাটা প্রাইভেট স্বাস্থ্য ব্যবসার হাতে তুলে দিচ্ছে। **দুই, ডাক্তারদের গণশত্রু সাজিয়ে, কোনো ছুতো পেলেই ডাক্তার পিটিয়ে, চিকিৎসককে হয়রান করে, মানুষের সামনে এক চটজলদি সমাধান হাজির করছেন। ডাক্তাররা জনস্বাস্থ্যের এই অব্যবস্থা নিয়ে সরব হতে আরও ভয় পাচ্ছেন।**

এ রোগের ওষুধ কিন্তু ডাক্তারদের হাতে নেই, আছে আপনাদের হাতে। **উ মা**

চেনা বিষয় অচেনা জগৎ

ফলম ফলে পাকামি

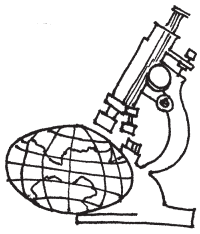

সমীরকুমার ঘোষ

অল্প বয়সেই ঘোষবাবুর সব চুল সাদা। বংশগত বংশ। বাসে ছেলেছোকরারা সিনিয়র সিটিজেন সিটে বসতে বলে, ব্যাঙ্কে কাউন্টার থেকে কর্মী গম্ভীর গলায় নির্দেশ দেন– পেনশনের লাইন ওইদিকে, ইত্যাদি। অফিসে কিছু ফচঁকে সহকর্মী এই কারণে তাঁর নাম দিয়েছে কার্বাইড। মানে ফলমূলের মতো চুলও পাকানো হয়েছে।

কার্বাইডে যে ফল পাকানো হয় সে তথ্য সবার জানা। সেই ফল খাওয়া ঠিক না বেঠিক, তা নিয়ে তর্কও জারি। সত্যিই কি কার্বাইড দিয়ে ফল পাকানো যায়? কীভাবে কার্বাইড এমন কর্মটি করে? এমন সাত-পাঁচ প্রশ্নের উত্তর হাতড়াতেই মাঠে নামা।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পইপই করে বলে দিয়েছেন, মা ফলেষু কদাচন। বাছারা, ফলের আশা করো না। সাধারণের কথা বাদ দিন, ভক্তেরাও ভগবানের বাণী উপেক্ষা করে ফলের পিছনে দৌড়চ্ছে। এবং সে ফল যেমন তেমন নয়, পাকা ফল। কিন্তু তা মেলে কোথায়! চারিদিকে নগরায়নের ঢল। আমতলা, জামতলা, বেলতলা, কাঁঠালপাড়া, কলাবাগানে গাছের দেখা নাই রে। ফল দূরস্থ। ভরসা আমার শ্যামাচরণ-এর মতো নগর-নাগরদের ভরসা বাজারে, রাস্তায়, স্টেশনের সামনে বসা ফলওয়ালারা।

এই দুনিয়ায় শুধু তো ফলই পাকে না, তার সঙ্গে অনেক কিছুই পাকে। কে, কখন, কীভাবে পাকে তার একটা 'পাকাপাকি' তালিকা বানিয়েছিলেন সুকুমার রায়। তার খানিকটা এরকমঃ

> 'আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
> কাঁচা ইঁট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
> রোদে জলে টিকে রঙ, পাকা কই তাহারে;
> ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে।
> হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে
> জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে।
> লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে?
> বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে!'

সুকুমারী-তত্ত্ব বুদ্ধি গুলিয়ে দিতে পারে। সহজ হিসাবে আসি। ধরা যাক, আপনার বাড়িতে আমগাছ রয়েছে। আপনি কবে উপেনের মতো 'দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে', এই আশায় বসে থাকতে পারেন। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরা পারেন না। কারণ গাছের ফল সব একসঙ্গে পাকে না। এদিকে ব্যবসায়ীদের একলপ্তে না পেলেও চলে না। অতএব খোদকারি। মঞ্চে কার্বাইডের প্রবেশ।

'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো' বহুল ব্যবহৃত লব্জ। শরৎ চাটুজ্জের 'শ্রীকান্ত'র ভট্চায্যিমশাইয়ের সেই অমর সংলাপটা মনে করুন, 'খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া।' চোর মনে করে দেউড়ির সিপাহীরা তাঁকে বেদম পিটিয়েছিল, এ তারই প্রতিক্রিয়া। কিলিয়ে সত্যিই কাঁঠাল পাকানো যায় কিনা, তা হাতে-কাঁঠালে প্রমাণ করা কঠিন। কে খামোখা হাত জখমের ঝুঁকি নেবে। আর অন্য ফলের ক্ষেত্রেও এই দাওয়াইয়ের উল্লেখ নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে-– প্রাকৃতিক নিয়মে গাছে ফল ধরে, সে ফল আপনিই পাকে। তাকে খামোখা পাকাবার জন্য এত কসরত করার দরকারটা কী!

প্রকৃতি ফলকে পাকানোর জন্য তার মধ্যে এক ধরনের জৈব গ্যাস তৈরি করে। নাম ইথিলিন। রাসায়নিক সঙ্কেত সি টু এইচ ফোর। দুটো কার্বন আর চারটি হাইড্রোজেন কণা মিশিয়ে তৈরি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না।' ফলের ক্ষেত্রেও তাই। ফলও মানুষের বা পাখির পেটে যাবার জন্য পাকে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে তার অস্তিত্ব। ফলকে পাকানোর জন্য মেহনত করে কাইনেজ, অ্যামাইলেজ, হাইড্রোলেজ, পেকটিনেজ, অ্যানফেসায়ানিন ইত্যাদি উৎসেচক। তাদেরকে কাজ করতে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেয় ইথিলিন। এই উৎসেচক বা এনজাইমগুলো কেউ ফলে রঙ ধরায়, কেউ সুগন্ধ তৈরি করে, কেউ জটিল কার্বোহাইড্রেটকে ভেঙে সরল করে, কেউ ফলকে নরম করে। নরম হয়ে ওঠার পর একদিন ফলটি গাছের শরীর থেকে টুপ করে মাটিতে পড়ে। ফলের ভেতরে থাকে বীজ। চলিত কথায় আঁটি। তা আপাতভাবে পুষ্টি সংগ্রহ করে তাকে ঘিরে থাকা শাঁস থেকে। তারপর মাটির শরণ নেয়। শিকড় বের করে আঁকড়ে ধরে প্রকৃতির কোল। নতুন গাছ জন্মায়। গাছ যেন জানে, পশুপাখিরা তার ফল খেয়ে উজাড় করবে (এতে বীজ অন্যত্র ছড়াতে সাহায্যও করে), প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক নষ্ট হবে। তাই ফলেরা সংখ্যায় অনেক, মানে বীজও অনেক। 'কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে'র মতো জীবনের ধারা বয়ে চলে।

কাঁচা অবস্থায় ফল পেড়ে নিলেও তার মৃত্যু হয় না। ভেতরে

নানা রাসায়নিক কর্মকাণ্ড চলতেই থাকে। ইথিলিন গ্যাসও তৈরি হয়। তাই গাছ থেকে কাঁচা অবস্থায় পেড়ে রেখে দিলেও সে পাকে। ইথিলিন গ্যাস বোঁটার অংশ খোলা পেলে উবে যেতে পারে। মানুষ এই কৌশল ধরতে পেরে তাকে খড় বিছিয়ে রাখে, খবরের কাগজ দিয়ে সোহাগে, আদরে মুড়ে রাখে। যেন প্রসবের আগে নার্সিহোমে ভর্তি রাখা। এক সময়ে মা-মাসিরা চালের ড্রামেও আম, পেঁপে ইত্যাদি ফলকে রেখে দিতেন।

এ তো গেল প্রাকৃতিক প্যাঁচ- পয়জার। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। সে সব সময়েই খোদকারি করতে চায়। তাতেই খুঁজে পায় কার্বাইডকে। পুরো নাম ক্যালসিয়াম কার্বাইড। রাসায়নিক সঙ্কেত সিএ সিটু। একটা ক্যালসিয়ামের সঙ্গে দুই কণা কার্বন। সাদা চুনের মতো দেখতে। একটা সময়ে অনেক বাড়িতেই গ্যাসের আলো জ্বালানো হত। নিচেটা কৌটোর মতো, ওপরে সরু নল। কৌটোয় একটা পাত্রে দেওয়া হত কার্বাইড। বাইরে থাকত জল। জল একটু একটু করে ঢুকত কার্বাইড-পাত্রে। তৈরি হত অ্যাসিটিলিন গ্যাস। দাহ্য। নলের মুখে আগুন দিলে আলো ছড়াত। মোটর গ্যারেজে গাড়ির গায়ে যা দিয়ে ঝালাইকম্মো চলে, তাতেও অ্যাসিটিলিন লাগে। অক্সিজেন সিলিন্ডার আর কার্বাইড আধার থেকে দুটো নল ব্লো পাইপে গিয়ে মিলেমিশে তৈরি করে অক্সিঅ্যাসিটিলিন গ্যাস। যার তাপ অক্লেশে লোহা গলাতে পারে। অ্যাসিটিলিন আর ইথিলিন সমগোত্রীয়। এ দিয়েও দিব্যি কাজ চলে যায়। সবচেয়ে বড় কথা কার্বাইড সস্তা। ব্যবসায়ীরা এটাকে নানাভাবে ব্যবহার করে। কেউ জলে মিশিয়ে তার মধ্যে ফল ডুবিয়ে রাখে, কেউ ফলের ওপরে ছিটিয়ে দেয়, কেউ দেয় বস্তায় ছোট ছোট টুকরো করে গুঁজে। কলার ক্ষেত্রে কাঁদির গোড়া চিরে কার্বাইড পেস্ট মাখিয়ে দেয়। যাঁরা বাজারে ফল বেচেন, বিশেষত কলা, তাঁদের কাছে কার্বাইড থাকে। কার্বাইড বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে অ্যাসিটিলিন তৈরি করে।

কাঁঠাল পেড়ে বস্তায় রেখে দিলে দু-তিন দিনে আপনা-আপনিই পাকে। এঁচোড়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। বোঁটায় কার্বাইড মাখিয়ে দিল নরম হয় বটে, তবে তা কাঁঠাল হয় না, নরম এঁচোড় হয়। তাতেই 'এঁচোড়ে পাকা' বিশেষণের জন্ম। মানে সময়ের আগেই পেকে যাওয়া। অকালপক্ক।

প্রসঙ্গত জানাই, সাইট্রাস ফুড মানে লেবুজাতীয় ফল কার্বাইড দিয়ে পাকানো যায় না। গাছ থেকে পেড়ে নেওয়ার পর সংযোগ ছিন্ন হয়ে এই ধরনের ফলের ভেতরকার রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো অচল হয়ে পড়ে। ইথিলিন বা অ্যাসিটিলিন গিয়ে উদ্দীপনা দেওয়ার কাউকে পায় না।

পাকা এবং পাকানোর মধ্যে ফারাক আছে। পাকা ব্যাপারটা নিজে থেকে হয়। যেমন, কোনো কিশোর-কিশোরী লুকিয়ে নিষিদ্ধ বই পড়ে, বড়দের বড়সুলভ কাজকর্মে লুকিয়ে নজরদারি করে নিজে নিজেই পেকে ওঠে। স্বনির্ভর প্রকল্প। আবার তাকেই যদি কোনো দাদা, বৌদি বা অল্পবয়সী কাকা-কাকিমা দিব্যজ্ঞান জোগান দেন, তা হল পাকানো। তবে এত কিছুরও দরকার পড়ে না, প্রকৃতিই যথা সময়ে শিখিয়ে দেয়। 'ব্লু লেগুন' ছবিতে যা দেখানো হয়েছিল। ফলের মধ্যে আপেলে সবচেয়ে বেশি ইথিলিন তৈরি হয়। ফলে বস্তাবন্দী নেসপাতি বা বেদানার মধ্যে খানকয়েক আপেল রেখে দিলে সে-ই সবাইকে পাকিয়ে দেয়। অনেকটা একই ক্লাসে দু-তিন বছর ফেল করে রয়ে যাওয়া ধেড়ে ছাত্ররা যেমন বাকিদের পাকায়, তেমনি। কলেজে ইউনিয়ন নেতারাও সেই ভূমিকা পালন করে। আপেল দিয়ে অন্য ফল পাকানোর প্রথা হিমাচল প্রদেশে আছে। বিদেশে ইথিলিন চেম্বারে ফল রেখে পাকানোর চল আছে। যা স্বাস্থ্যকর, বিজ্ঞানসম্মত। সস্তার কার্বাইড থাকতে আমাদের দেশ অত ঝক্কির মধ্যে যেতে নারাজ।

সাধারণের ধারণা, কার্বাইড, যাকে ফল-ব্যবসায়ীরা 'মসালা' বলে, দিয়ে ফল পাকালে তা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। অনেকদিনই এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কার্বাইডের সঙ্গে অনেক সময়েই আর্সেনিক বা ফসফরাস মিশে থাকে, তা থেকে ক্ষতির আশঙ্কার কথাটা অবশ্য স্বীকার করা হত। কিন্তু ২০১১-র ফুড সেফ্টি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস রেগুলেশনস কার্বাইড ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অভিযোগ, এটি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী (কারসিনোজেনিক)। (প্রোহিবিশন অ্যান্ড রেসট্রিকশন) অভ এফএসএসআর ২০১১-র চ্যাপ্টার ২, ক্লজ ২.৩.৫ পরিষ্কার জানাচ্ছেঃ 'নো পার্সন শ্যাল সেল অর অফার অর এক্সপোজ ফর সেল অর হ্যাভ ইন হিজ প্রেমিসেস ফর দ্য পারপাস অভ সেল আন্ডার এনি ডেসক্রিপশন, ফ্রুট হুইচ হ্যাভ বিন আর্টিফিসিয়ালি রাইপেন্ড বাই ইউজ অফ অ্যাসিটিলিন গ্যাস, কমনলি নোন অ্যাজ কার্বাইড গ্যাস।' অনেক ব্যবসায়ী অনৈতিকভাবে কার্বাইডের পাশাপাশি ইথেফন ও অক্সিটোসিনও ব্যবহার করে ফলকে নধর চেহারা দিতে। এথোফেন কীটনাশক। ফল পাকানোর কাজে এর ব্যবহারে অনুমোদন নেই। অক্সিটোসিন স্তন্যপায়ীদের হরমোন। পশুদের ওষুধে এর ব্যবহার অনুমোদিত হলেও, টাটকা ফল বা সবজিতে দেওয়া নৈব নৈব চ।

আপাতভাবে গাছপাকা আর পেড়ে পাকানো ফলে কোনো ফারাক থাকে না। আবার থাকেও। যেমন, গাছপাকা ফল কৃত্রিমভাবে পাকানো ফলের থেকে 'পূর্ণতর' হয়। কারণ, তা খসে পড়ার আগে পর্যন্ত গাছের সঙ্গে লেগে থাকার কারণে যথাযথ পুষ্টি পায়। 'প্রি-ম্যাচিওর বেবি' নয়। বৃদ্ধিটা ভাল হয়। কৃত্রিমভাবে পাকানো ফল তুলনায় ছোট। গাছপাকা ফল আপাদমস্তক পাকে। পাকানো ফলের ভেতরটা অনেক সময়েই কাঁচা থেকে যায়, মিষ্টি ফল টক লাগে ইত্যাদি। এত কিছুর পরে শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশিত ফলের আশা করবেন, না করবেন না, নিজেকেই ঠিক করতে হবে। উমা

ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ স্মরণ

ওঁর না-কে হ্যাঁ করা যেত না

অরুণকুমার ঘোষ

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি অল্প রোগভোগের পর হঠাৎ চলে গেলেন ডঃ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, মাত্র ৭১ বছর বয়সে। তার পরদিনই বিভিন্ন সংবাদপত্রে ওঁর কর্মজীবনের বিষয়ে বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হল। উনি একজন আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ ছিলেন এবং ওঁর উদ্যোগেই পূর্ব কলকাতার জলাভূমি 'রামসার সাইট' হিসাবে ঘোষিত হয়। জলাভূমি ও মানুষের স্বার্থে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি তাঁর স্মৃতিতে তাজ গেটওয়ে ব্যাঙ্কোয়েট হলে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সারা হলে ওঁর ছবি ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। ওঁর বর্ণময় জীবনের প্রতি পরিবার ও প্রিয়জনের শ্রদ্ধার্ঘ্য। বক্তারা অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানালেন।

আমার সঙ্গে ডঃ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের প্রথম পরিচয় হয় ১৯৯৯ সালে। আমার মেয়ে সুদেষ্ণা তখন ভূগোল নিয়ে এম এসসি পাশ করে স্কুলে শিক্ষকতা করছে। ওর ইচ্ছা জলাভূমির ওপর গবেষণা করার। কার কাছে খবর পেলাম মনে নেই, বোধহয় প্রয়াত ডঃ সুভাষরঞ্জন বসু। উনি বললেন যে 'এ ব্যাপারে মোস্ট নলেজেব্‌ল লোক হচ্ছেন ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' শুনেছি, উনি অত্যন্ত 'মুডি' লোক, একবার না করে দিলে আর হ্যাঁ হবে না। উনি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ বিভাগে চাকরি করেন। আগে থেকে সময় ঠিক করার সুযোগ নেই। একদিন সোজা চলে গেলাম অফিসে কিছুটা ভয়ে ভয়ে, যদি দেখা না করেন। আমার বিজনেস কার্ড পাঠালাম ব্যক্তিগত কাজের কথা লিখে। মিনিট পাঁচেক বাদে ডাক এল দেখা করার। আসার কারণ বললাম। শুনলেন এবং বললেন, 'ছোটদের জন্য আমার সময় আছে, বড়দের জন্য নয়।' এই বক্তব্যের কারণ পরে বুঝেছিলাম। উনি ফোন নম্বর দিয়ে মেয়েকে যোগাযোগ করতে বললেন।

কিছু বছর পরের ঘটনার কথা বলি। আমি নিজে একজন চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং একটি ছোট প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভ্যাল্‌ভ-এর ব্যবসা করি, যা কিনা ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র এবং ওয়াটার ওয়ার্কস-এ ব্যবহার হয়। সিইএসসি আমাদের খুব বড় ক্লায়েন্ট। ওদের বজবজ থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ইউনিট-১ এবং ইউনিট-২ তে আমাদের অনেক প্রোডাক্ট সাপ্লাই হয় ১৯৯৫ সালে। এবারে ইউনিট-৩ বসাবার তোড়জোড় চলছে। আমরা রেগুলার সিইএসসি অফিসে যোগাযোগ রাখছি। খবর পেলাম পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কে একজন ড. ঘোষ পরিবেশ ছাড়পত্র আটকে দিয়েছেন। সিইএসসি-র প্রোজেক্ট ম্যানেজারকে বললাম না যে আমি ড. ঘোষকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। যা হোক ওঁকে ফোন করে জানলাম, উনি বজবজ সাইট পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে আশপাশের মানুষজন ফ্লাই অ্যাশ-এর জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সর্বত্র ছাই— এমনকি খাবার ও জলেও এই ফ্লাই অ্যাশ। ফ্লাই অ্যাশ ডিসপোজাল সিস্টেমও অপ্রতুল। এই অবস্থায় থার্ড ইউনিট অনুমোদনের কোনো প্রশ্নই নেই। আমায় উনি জানালেন, প্রকল্প অনুমোদন না করে দিয়েছেন। সিইএসসি রাজনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক চেষ্টা করেও ডঃ ঘোষের 'না'-কে 'হ্যাঁ' করাতে পারলেন না। কিছু মানুষের 'বাড়া ভাতে ছাই পড়ল।' যা হোক পরবর্তী সময়ে সিইএসসি দিল্লি থেকে প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে তাদের তিন নম্বর ইউনিট চালু করল। এর কিছুদিন পরেই পরিবেশ বিভাগ থেকে ওঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। উনি স্বেচ্ছা অবসর নেন মাত্র ৫৭ বছর বয়সে।

দীর্ঘ ১৮ বছরে ওঁকে বিভিন্ন সময় দেখেছি ও সাধারণ আলাপচারিতায় বুঝেছি, অত শিক্ষিত, সৎ, দৃঢ়চেতা মানুষ আজকের দিনে দুর্লভ। ওঁর মনটা ছিল শিশুর মতো সরল। নিজে ছিলেন শিল্পী এবং হাসিটা ছিল সংক্রামক, যে বিশেষণ ওঁর ছেলের দেওয়া। আশা করি ওঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী এবং সত্যিকারের বন্ধুরা ওঁর আরাধ্য কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ওঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। উমা

যতটা বড় ভাবতাম তার চেয়েও বড় ছিলেন

ডঃ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

(জন্ম ৩০-৫-১৯৪৭। প্রয়াণ ১৬-২-২০১৮)

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ চলে যাবার পর চারদিকে যেন একটা বেশ একটা শোকাহত ভাব জেগে উঠেছে। যে প্রচারমাধ্যম ওঁকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল, তারাও স্তুতিতে ভরিয়ে দিল। দেখেশুনে কাজী নজরুলের সেই গানটা মনে পড়ল– 'জীবনে যারে তুমি দাও নি মালা, মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল।' তবে যে কোনো কারণেই হোক বেশ কিছু মানুষই ওঁর কাজ সম্পর্কে, কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এটা একটা বড় আশার খবর।

মানসিকভাবে তৈরি ছিলাম; ওঁর চলে যাওয়াটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। ১৫ তারিখে অবস্থার বেশ অবনতি হয়। খবরটা পাই ওঁর কর্মসঙ্গী ধ্রুবার কাছ থেকে। অনুমান করছিলাম, অনেক বড়বড় ধাক্কা সামলে দিলেও এই লড়াইটায় বোধহয় আর পেরে উঠলেন না। পরদিন অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি উনি আর নেই। সকালে যিনি আমায় খবরটা দেন তাঁর আশঙ্কা ছিল, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের মরদেহও হাইজ্যাক হয়ে যেতে পারে। কোত্থেকে এমন ধারণা হল তা জানি না। বোড়াল শ্মশানে আগাগোড়া ছিলাম। না, কোনও মন্ত্রী বা আমলার সশব্দ উপস্থিতি দেখি নি।

১৭ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ওঁর প্রয়াণের পরদিন কলকাতার এক ইংরেজি দৈনিকে যে প্রতিবেদনটি বেরোল তার শিরোনাম ছিল 'The wetlands weep today'। লক্ষ্য করার বিষয় wetland বলা হল East Kolkata Wetland (EKW) বলা হল না। ঠিকই তো, ধ্রুবজ্যোতি ঘোষকে কেবল পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে আটকে রাখলে চলবে কেন! তা ওঁর গবেষণার ক্ষেত্র হলেও না। আহা কি সুন্দর গবেষণাক্ষেত্র। খোলা আকাশের নিচে শহরের নোংরা আবর্জনা মেশা জলকাদায় হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে চষে বেড়িয়েছেন বছরের পর বছর। ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে নিজের হাতের তালুর মতো চিনতেন। সেই তিনি, পরিবেশবিজ্ঞানী হিসেবে যাঁর আজ জগৎজোড়া নাম। বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে পরিবেশবিজ্ঞানীরা এই ভেতো বাঙালির কাছে ছুটে এসেছেন কীভাবে তাঁদের দেশের জলাভূমি বাঁচানো যায় তার শিক্ষা নিতে। অথচ আমরা? চূড়ান্ত নির্লিপ্ত থেকে ওঁকে বা ওঁর কাজকে একটুও গুরুত্ব দিই নি। না জুটেছে সেরা বাঙালি শিরোপা, না বঙ্গবিভূষণ! উল্টে জমি মাফিয়াদের হুমকি ফোন পেতেন নিয়মিত। আর পেয়েছেন সরকারি দপ্তরের চূড়ান্ত উপেক্ষা। শেষদিকে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। রিয়েল এস্টেট লবির সঙ্গে আর পেরে উঠছিলেন না। বিপদ যে কতটা তা বুঝতে পেরেছিলেন। উৎস মানুষের ফেসবুকে একজন মন্তব্য করেছেন, 'খুবই খারাপ খবর। জলাভূমি গ্রাস করতে চাওয়া জমিমাফিয়ারা অবশ্য মোচ্ছবে মাতবে। বুড়োটা একাই প্রায় তাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে যাচ্ছিল। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির জায়গায় গড়ে উঠবে সুরম্য নগরী। না হলে উন্নয়ন হবে কি করে!'

ধ্রুবজ্যোতিবাবু কলকাতাবাসীকে সতর্ক করে বলতেন, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি হল শহরের কিডনি, তাকে নষ্ট হতে দিলে আমাদের চেন্নাইয়ের দশা হবে। দিনের পর দিন কলকাতা ডুবে থাকবে। এই জলাভূমি না থাকলে এ শহরের দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন লিটার নোংরা জল কোথায় যাবে? আর ২৫০০ টন আবর্জনা, তারই বা কী হবে? বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই নোংরা জল শোধন করতে সরকারের এক পয়সাও খরচ করতে হয় না, উল্টে জলাভূমির মানুষ ওই জল ব্যবহার করে টাটকা সবজি, মাছের জোগান দিয়ে চলেছেন। যার জন্য উনি কলকাতাকে 'ভর্তুকি পাওয়া শহর' বলতেন। এসব কথা শুনলে তো পরিবেশ বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে। যাঁদের এসব কথা শোনা উচিত, তাঁদের কান দিতেই বয়ে গেছে।

Serendipity কথাটার আভিধানিক মানে মেঘ না চাইতে জল। ধ্রুবজ্যোতিবাবু তা ব্যবহার করতেন অন্য কিছু বোঝাতে।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কলকাতাবাসীকে বছরের পর বছর ধরে সবজি ও মাছের অফুরন্ত জোগান দিয়ে চলেছে, তাই উনি মনে করতেন কলকাতা সাবসিডাইজড সিটি। ওঁর পরামর্শে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে SCOPE সংস্থাটি প্রধানত জলাভূমি নিয়ে কাজ করে, ছাত্রছাত্রীদের পূর্ব কলকাতা জলাভূমি দেখাবার ব্যবস্থা চালু করে। অনেকেই তা জানেন। তাছাড়া জলাভূমির মানুষদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেও কাজ করছেন। উনি বারবার বলতেন, জলাভূমির মানুষরাই আমার প্রকৃত শিক্ষক। তা নিছক কথার কথা ছিল না। The Trash Diggers বইটির ভূমিকা লিখেছেন ধাপার এক জঞ্জালকুড়ানি কল্যাণী মণ্ডল, যিনি জঞ্জাল চাপা পড়ে মারাও যান।

গান্ধীবাদী পরিবেশবিদ প্রয়াত (২০১৬) অনুপম মিশ্রর নাম ওঁর কাছেই প্রথম শুনি। যাঁর 'আজ ভি খড়ে হ্যায় তলাব' বইটি ২ লাখ কপি বিক্রি হয়। ধ্রুবজ্যোতিবাবু মনে করতেন বইটি বাংলায় অনুবাদ করা দরকার। বইটি দেখিয়ে বললেন, যদি সময় পাই উৎস মানুষে মিশ্রজিকে নিয়ে একটা লেখা দেব। তা আর হয় নি। ওঁর ব্যস্ততা দেখে আমরাও তাগাদা দিই নি। বাংলায় দুটি বই লিখেছিলেন— ১) নোংরা জলে মাছচাষ। পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত। বইটি এখন পাওয়া যায় না। ২) গুমোট ভাঙ্গার গান (দ্বিতীয় সংস্করণ)— উৎস মানুষ প্রকাশিত। পাওয়া যায়। ২০১৬-য় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দেন উনি। আমাদের আফসোসের শেষ নেই, সেই বক্তৃতার রেকর্ডিং নষ্ট হওয়ায় উৎস মানুষ-এর ওয়েবসাইটে দেওয়া যায় নি। ওঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'উবুন্তুঙ্ম আমরা আছি তাই আমি আছি।' উবুন্তু কথাটা ওঁর কাছেই প্রথম শুনি। বলেছিলাম এমন খটমট কথা মানুষ বুঝবে? তাতে উনি ছোট একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। উবুন্তু আফ্রিকার এক উপজাতি ভাষা। উনি চেয়েছিলেন 'উবুন্তু' বাংলায় চালু হোক আর তা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা থেকেই। এবারে স্মারক বক্তৃতা শুনতে এসে হঠাৎ মোবাইলে সমীরের ছবি তুলে দেখালেন। বুঝলাম সমীরের একেবারে পোর্ট্রেট ফেস, তাই তুলেছেন। ছবিটাও দারুণ তুলতেন। জানুয়ারি ২০১৬-য় উৎস মানুষে ওঁর একটি লেখা বেরোয় 'বাপ-ঠাকুরদাদার চাষ'। যেমন চাঁচাছোলা কথা বলতেন বক্তৃতাতেও তেমনি। স্মারক বক্তৃতার পর একজন তো বলেই বসলেন, 'এমন থার্ডক্লাস লেকচার জীবনে শুনি নি'। আসলে ভদ্রলোকের আঁতে ঘা লেগেছিল। কথাটা ধ্রুবজ্যোতিবাবুকে বলাতে মুচকি হেসেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বজলুর রহিম সম্পাদিত মাসিক গণস্বাস্থ্য পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় প্রয়াত ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের 'একজন পরিবেশ কর্মীর ভাবনাচিন্তা' শীর্ষক লেখাটি মুদ্রিত হয়েছে। যা এপ্রিল ২০১৭-র উৎস মানুষে বেরোয়।

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ বহু পুরস্কার পান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের UN GLOBAL 500 AWARD ছাড়াও ২০১৬-য় LUC HOFFMANN পুরস্কার পান। যাকে পরিবেশবিজ্ঞানীদের নোবেল প্রাইজ বলা হয়। উনিই প্রথম ভারতীয়, এই পুরস্কার পান। এই পুরস্কার পাওয়ার পর এখানকার এক ইংরেজি দৈনিক লিখেছিল— '...Dhrubajyoti Ghosh has demonstrated immense understanding of how the East Kolkata Wetlands works and has developed an unusual ability to locate community wisdom in managing ecosystems and identity how communities live creatively with nature. This he underlines as the philosophical basis of all green goals.'। বারবার বলতেন পরম্পরাগত জ্ঞান ধরে রাখতেই হবে। গুমোট ভাঙ্গার গান বই-এর শুরুতে প্রেক্ষাপটে তা নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন।

প্রথমবার ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। খানিকটা সুস্থ হয়ে ফিরেও এলেন। দেখতে গেছিলাম। হোয়াটস-অ্যাপ চালাচালি হত। একদিন মেসেজ পাঠালেন, 'আমার মা যশোরের সাগরদাঁড়ির, তাই ওঁর ভেতর অত তেজ।' জবাব দিলাম, 'like mother like son'। সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন, মায়ের সঙ্গে আমার কোনো তুলনাই হয় না। ওঁর মায়ের লেখা 'খুঁজে বেড়াই' আমরা বইমেলায় স্টলে রেখেছিলাম। রাসবিহারীর মোড়ে কল্যাণ ঘোষের স্টলেও দেওয়া হয়েছিল। একদিন কল্যাণ বললেন বিক্রি হয়ে গেছে। ওঁকে জানাতেই বললেন, 'এখুনি এসে মিষ্টি খেয়ে যাও'। খুব মাতৃভক্ত ছিলেন।

ওঁর প্রয়াণের পরদিন ১৭/২-র স্টেটসম্যান লিখল ''As he lay in a city hospital in coma for a few days prior to life ebbing out of his body on the morning of Friday, February 16, the molten waste from the plastic units flowed along the fishery canals. Dhrubajyoti Ghosh had lived in the dread that they would finally kill the fish."।

উৎস মানুষের পক্ষ থেকে ওঁকে আমাদের প্রণাম।

বরুণ ভট্টাচার্য

প্রয়াত শঙ্কর চক্রবর্তী

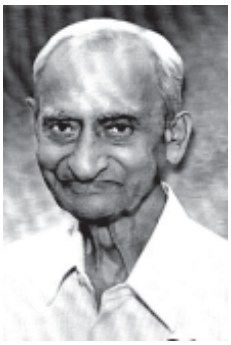

(জন্ম ২৫-১-১৯৩৩। প্রয়াণ ১৯-১২-২০১৭)

জনবিজ্ঞান আন্দোলন জোর ধাক্কা খেল বলাই যায়। গত দু-তিন মাসের মধ্যেই পরপর চারজন– দীপঙ্কর চক্রবর্তী, ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, রতনলাল ব্রহ্মচারী ও শঙ্কর চক্রবর্তী প্রয়াত হলেন। এঁরা কেবল সারাজীবন একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎসর্গ করেছেন, যা মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কী সব কাজ! জলে আর্সেনিকদূষণ নিয়ে গবেষণা, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি যা কলকাতার ফুসফুস ও কিডনি, তাকে অক্ষত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও তা নিয়ে মানুষকে সচেতন করা, প্রকৃতি ও পরিবেশ জীববৈচিত্র্য নিয়ে সুদীর্ঘ সময় নিয়ে লেগে থাকা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

প্রয়াত শঙ্কর চক্রবর্তীর লড়াইটা ছিল মানুষের মনের গভীরে যে কুসংস্কারের বীজ ধীরে ধীরে মহীরুহ হয়ে মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে তাকে সাফ করা। হাত-পা ছুঁড়ে 'কুসংস্কার দূর হটো' বললেই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াবে এমন তো নয়। মানুষকে সমানে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে, সভ্যতার চাকা এগিয়ে চলেছে প্রধানত বিজ্ঞানকে নির্ভর করে। তা সে চিকিৎসা বিজ্ঞানই হোক বা স্মার্টফোন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষ ভোগ করছে কিন্তু মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শয়তানকে তাড়াতে গেলেই যত গণ্ডগোল। তাই সুবক্তা শঙ্কর চক্রবর্তীর প্রয়াণের সঙ্গে আমরা হারালাম এমন একজন মানুষকে যিনি বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ও মানুষের মনে বিজ্ঞান চেতনা ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়েছিলেন। ওঁর প্রয়াণে জনবিজ্ঞান আন্দোলন যোগ্য সেনাপতিকে হারাল। এমনই এক সময়ে ওঁকে হারালাম যখন ডারউইন ও নিউটনের আবিষ্কার নিয়েও বালখিল্যের মতো উক্তি শোনা যাচ্ছে। উনি শিখিয়ে গেছেন, একমাত্র জনবিজ্ঞান আন্দোলনই পারে একে রুখে দিতে। যে সংগঠনকে তিলতিল করে গড়ে তুলেছিলেন তিনি আমৃত্যু সেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-র সভাপতি ছিলেন।

বরুণ ভট্টাচার্য

গৌরী লঙ্কেশ : ব্যাটল এহেড

ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শাসক ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের দমন-পীড়ন সর্বস্তরে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিতে সদা সচেষ্ট। এই প্রেক্ষিতে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সমাজ সচেতন এবং নির্ভীক পত্রিকা সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের হত্যা এক অপূরণীয় ক্ষতি। গত ২৯শে জানুয়ারি, ২০১৮, গৌরী লঙ্কেশের পঞ্চান্নতম জন্মদিনে যাদবপুরের স্কুল অব্ মিডিয়া, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কালচার এবং সাউথ এশিয়ান উইমেন ইন মিডিয়ার যৌথ উদ্যোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ এল রায় প্রেক্ষাগৃহে দ্য ওয়ে আই সি ইট : আ গৌরী লঙ্কেশ রিডার (প্রকাশক - নবায়ন, ব্যাঙ্গালোর) বইটির উদ্বোধন হয়ে গেল। বইটির লেখক ও অনুবাদক চন্দন গৌড়া নিজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় ছিল— গৌরী লঙ্কেশ : ব্যাটল এহেড। (Gouri Lankesh: Battle Ahead)। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কর্ণাটকের বিশিষ্ট সাংবাদিক পামেলা ফিলিপোষ এবং লেখক অনিতা অগ্নিহোত্রী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শিখা মুখোপাধ্যায়ের সুচারু পরিচালনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য অনুষ্ঠান শুরুর আগে সম্প্রতি সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের নানা ঘটনার সমন্বয়ে তৈরি একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। শিখা মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকতার বর্তমান সংকটের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেন— বিশেষ করে কিভাবে রাজনৈতিক প্রশ্রয় সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রকাশনাকে জটিল করে তুলেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। সুতরাং সামনের দিনগুলি আরও ভয়ঙ্কর!

পামেলা ফিলিপোষ তাঁর সঙ্গে গৌরী লঙ্কেশের ঘনিষ্ঠতার নানা ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র প্রকাশনা ছাড়াও গৌরী লঙ্কেশ কর্ণাটকের প্রান্তিক মানুষের জন্যে অনেক কাজ করেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল — ফলত তিনি মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। অনিতা অগ্নিহোত্রী প্রথমেই বলেন যে, কিভাবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন গৌরী লঙ্কেশের হত্যার খবরে। প্রকাশিত বইটি পড়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন। অনিতা অগ্নিহোত্রী সাহিত্যের আঙিনার বাইরে তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতন মনের উপলব্ধি বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচনা বেশ জমে ওঠে। প্রশ্ন ওঠে — সাংবাদিকদের নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ হওয়া জরুরি। কিন্তু রাষ্ট্র বা শাসকের বিরুদ্ধে কিছু লিখলে নিরপেক্ষ থাকার তকমাটা থাকে কোথায়। আলোচনার শিরোনাম যথার্থ। যুদ্ধের সবে শুরু — শেষ কোথায় সেটা ভবিষ্যতের হাতে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনেক সচেতন মানুষের উপস্থিতি দেখে মনে হয় অনুষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

শ্যামল ভদ্র

চিঠিপত্র

সস্তায় গাড়ি, কিছু প্রশ্ন

মহাশয়,

উৎস মানুষ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ সংখ্যার সময়োপযোগী সম্পাদকীয়র জন্য সাধুবাদ জানিয়েও সেটির দু'টি বাক্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য না করে পারছি না। বাক্য দুটি : 'আমরা ত' রাজ্যে গাড়ির কারখানা হল না বলে দুঃখে মরে যাচ্ছি। সস্তায় গাড়ি কিনতে না পারার আক্ষেপ যাচ্ছে না।'

সম্পাদক মহাশয়ের ধারণা ভুল যাঁরা এ 'রাজ্যে গাড়ির কারখানা হল না বলে দুঃখে মরে' যাচ্ছে, তাঁরা সবাই 'সস্তায়' গাড়ি কিনতে' লালায়িত ছিলেন। এই অধমের দ্বিচক্রযানের বাইরে কোনো কিছুরই কেনার সাধ্য ছিল না। কিন্তু সেও গাড়ির কারখানা হল না বলে 'দুঃখে মরে যাচ্ছে।' কারণ সস্তায় গাড়ি সিঙ্গুরে না হয়ে সানন্দায় হলেও তা বাঙালির পেতে অসুবিধে ছিল না বা কলকাতার বায়ুদূষণের সুরাহা হত না। বাংলায় এ কারখানা হলে রাজ্যবাসীর যা লাভ হত তা অন্যত্র। যে বিশাল বেকারত্বের বোঝা তরুণদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা কিছুটা লাঘব হবার সম্ভাবনা তৈরি হত। ওই একটা কারখানা তার সাক্ষাৎ কর্মী ও তাদের পোষ্য ছাড়াও অন্য যাদের অন্নসংস্থান করে দিত তারা সংখ্যায় নগণ্য হলেও সেটি এ রাজ্যের হারানো শিল্প সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে অনুঘটকের কাজ করতে পারত। সম্পাদকমশাই একটু খবর নিলে জানতে পারবেন এ আক্ষেপ সিঙ্গুরে চাষীদের মধ্যেও আছে, যাঁরা অনেকেই 'অনিচ্ছুক' ছিলেন। এটা অনস্বীকার্য কারখানা স্থাপনের প্রয়াসে অনেক ত্রুটি ছিল। তাড়াহুড়োর কারণে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে জমিদাতাদের তৈরি করা হয়নি। আইনগত দিকটাও অবহেলিত ছিল। এসবেরই খেসারত দিতে হয়েছে।

স্বাধীনতার জন্মলগ্নে যে রাজ্য ভারতে সবচেয়ে শিল্পসমৃদ্ধ ছিল কয়েক দশকের মধ্যে সে রাজ্য ক্রমে শিল্পে দীন হয়ে গেল নানা কারণে। তার একটা অবশ্যই আত্মঘাতী রাজনীতি। যখন সেই রাজনীতি আগের ভুল সংশোধনে প্রয়াসী হল তখন কৃষিস্বার্থ রক্ষার নামে আরেক নির্বোধ রাজনীতি বাধা হয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছাকৃত অবহেলা করা হল সেই সত্যকে, যে কৃষিতে কর্মসংস্থান সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। জমির তুলনায় অংশীদার বেশি। কৃষক পরিবারের অধিকাংশকেই কাজের অন্বেষণে পরিযায়ী হতে হয় বা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। এ রাজ্যের শিল্পায়ন ছাড়া গতি নেই। যাঁরা গাড়ির কারখানা বাধা দিয়েছিলেন, তাঁরাই এখন শিল্পপতিদের পেছন পেছন ঘুরছেন প্রসাদ পাবার জন্য।

যাঁরাই সিঙ্গুরের পাশ দিয়ে গেছেন (সম্পাদক মশাই গেছেন কি?) তাঁরাই শিল্পের কবন্ধ দেখে শিউরে উঠেছেন। শিল্প প্রচেষ্টার সেই শ্মশানভূমি দেখে 'দুঃখে মরে' যান না এমন সংবেদনহীন মানুষ খুব কমই আছেন। তাদের মনে এ প্রশ্ন না জেগে পারে না ভুল যা হয়েই থাক সেটা শোধরাবার কোনো পন্থা কি ছিল না? কারখানার জমিতে নির্মাণের ফলে কৃষির উপযোগী আর নেই। তাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে বিশাল বিনিয়োগ ও ততোধিক অধ্যবসায় প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই দশ বছরের বিরতিতে অনেক জমির মালিক কৃষি ছেড়ে অন্য জীবিকায় চলে গেছেন। জমি ফেরত দেবার প্রক্রিয়াও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মালিকানা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা। শুধু গোঁয়ার্তুমি দিয়ে যে কাজ করা হচ্ছে তার থেকে অনেক সহজে ওই জমির সদ্ব্যবহার করা যেত। সিঙ্গুরবাসী উপকৃত হত। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মানচিত্রে এই এক হাজার একর জমিটুকুর স্থান নগণ্য, ৫২ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমিতে ৪০০ হেক্টর! এই জমিটুকু কৃষির জন্য উদ্ধার করতে গিয়ে একটা বিশাল সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দেয়া হল। এ যুক্তিও অসার যে, এই উদাহরণ দেখিয়ে অন্যান্য কৃষি জমিতেও থাবা বসানোর আশঙ্কা রয়ে গেল। কারণ ততদিনে রাজ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে। শাসনক্ষমতা এসেছে তাদের হাতে কৃষি জমিতে কারখানা স্থাপনের বিরোধিতা যাদের ঘোষিত নীতি।

'খাদ্য সুরক্ষা'? পশ্চিমবঙ্গের অনেক ধানি জমি (হুগলী জেলাতেও) পাট চাষে চলে গেছে। কিছু অসাধু মিলমালিক ও দালালচক্রের কারসাজিতে পাটচাষীদের দুর্দশার অন্ত নেই। একের পর এক মিল বন্ধ হয়ে পাটের চাহিদাও কমে গেছে। উদ্বৃত্ত পাট ঘরে নিয়ে চাষী অনাহারে। সেই সব পাটচাষের জমি ধানচাষে ফিরিয়ে আনলে শুধু খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ত তা নয় গ্রামীণ দারিদ্র্যও কমত। ৪০০ হেক্টরের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়া যেত। আশা করি বোঝাতে পেরেছি, 'সস্তায় গাড়ি' না পাওয়া 'আক্ষেপের' একমাত্র কারণ নয়।

বিনীত

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

চিঠিপত্র

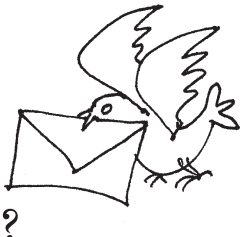

রামেন্দ্রসুন্দরের উল্লেখ নেই কেন?

মহাশয়,

বিশেষ বইমেলা সংখ্যায় (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮) ১৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক ভাষণের প্রতিবেদন পড়লাম। বক্তা ছিলেন সুখ্যাত জ্যোতির্বিদ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে জ্যোতিষের সমতুল্যতার যে ভ্রান্ত ধারণা সাধারণ মানুষ পোষণ করে থাকেন, অমলেন্দুবাবুর ভাষণে তাঁদের সম্বিত ফিরে পাওয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে প্রায় একশো বছর আগে যিনি আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' শীর্ষক গ্রন্থের 'ফলিত জ্যোতিষ' নিবন্ধটি জ্যোতিষের অবৈজ্ঞানিকতার বিষয়টি সম্ভবত প্রথম শিক্ষিত বাঙালির গোচরে আনে। তিনি লিখেছিলেন, 'ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চান, তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। ...তাহার পর হাজারখানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে।... পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে।...কেবল নেপোলিয়ন ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।'

এই অমূল্য নিবন্ধটির উল্লেখ রাজশেখর বসু (পরশুরাম) তাঁর 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' প্রবন্ধেও করেছেন।

অমলেন্দুবাবুর ভাষণে রামেন্দ্রসুন্দরের নিবন্ধটির উল্লেখ থাকলে ভাল হত।

ভবদীয়

তপোব্রত সান্যাল

সংগঠন সংবাদ

পাহাড় থেকে সাগর পদযাত্রা পরিবেশ সচেতনতায়

পরিবেশ সচেতনতায় হয়ে গেল পদযাত্রা। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ ৩৪ দিনে তা হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করেছিল। শুরু হয়েছিল টাইগার হিল থেকে শেষ হল গঙ্গাসাগরে এসে। ১০০০ কিমি অতিক্রম করেছিল ৩১ দিনে। পরিবেশকর্মীরা ঠিক করেছিলেন গঙ্গাসাগর পৌঁছে থামবেন। তাই আরো চারদিন পা চালিয়ে গেলেন। কেন না দীর্ঘ পথের ক্লান্তি তাঁদের কাবু করতে পারে নি। দিনে ২৫/৩০ কিমি পথ তাঁরা পাড়ি দিয়েছেন অনায়াসে। পদযাত্রা যে যে জায়গা দিয়ে গিয়েছে, সেখানেই মিলেছে বিপুল সাড়া। কৃষ্ণনগরে পদযাত্রীদের সমর্থনে ৩০০ লোকের মিছিল বলার মতো ঘটনা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক থেকে সাধারণ মানুষ নানানভাবে পদযাত্রীদের পাশে এসে উৎসাহ দিয়েছেন। অচেনা যুবক মন্দিরের চাতালে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; মন্দিরে পাখা চালিয়ে দিতে ভোলেন নি। পদযাত্রীদের ঘিরে কোথাও গান, কোথাও পথসভা হয়েছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা! পথে পেয়ারাবাগান, পুকুরভরা টলটলে জলও রয়েছে, আবার প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে বানানো পাহাড়, তাও। তাতে আবার আগুন লাগিয়ে পরিবেশকে আরো দূষিত করা হচ্ছে। ইঁটভাটা চাষের জমি নষ্ট করছে। বনসৃজনের নাম করে পরিবেশবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সোনাঝুরিতে ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো হচ্ছে। সে সব গাছের শেকড় অনেকদূর থেকে মাটির জল শুষে নেয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হয়ে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ডিঙিয়ে ৩৪ দিনের শেষে পদযাত্রীরা থামলেন। পরিবেশ নিয়ে সচেতন করতে এমন পদযাত্রা এ রাজ্যে আগে কখনও হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

(পদযাত্রার সৈনিক সঞ্জিত কাণ্ঠর প্রতিবেদনের নির্বাচিত অংশ)

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 20.00
৩৮ বর্ষ এপ্রিল-জুন ২০১৮ ২০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন

সুমন্ত বিশ্বাস
ফোন নং - ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/
৯১৪৩৭৮৬১৩৪
২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০০১২
(কলেজ স্ট্রীট কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম বছরে ৪টি সংখ্যা। চাঁদা ডাক খরচ সহ ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। **UBI**-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন **UBI** কলেজ স্ট্রীট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

**United Bank of India, College Street Branch,
Kolkata - 700073. UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. UTBI0COLI08**

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

ওয়েবসাইট : **http://www.utsomanus.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
https://www.facebook.com/utsomanus/

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (দুই খণ্ড একত্রে সংকলিত)	২০০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি	৫০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	১৫০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	১০০.০০
প্রতিরোধস্পৃহা অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	১০০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	১০০.০০
প্রমিথিউসের পথে	৪০.০০
লেখালিখি	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	৪০.০০
মূল্যবোধ	৫০.০০
আহরণ	২০০.০০

প্রাপ্তিস্থান : বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), জ্ঞানের আলো (যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড), রথীনদা (গোলপার্ক)।

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সমীরকুমার ঘোষ